وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● আগস্ট ২০২২

Web : www.al-itisam.com

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল এবং বলল, আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, ‘অভাব-অনটনের জন্য প্রস্তুত হও’

(সিলসিলা ছহীহা, হা/২৮২৭)

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، محرم ١٤٤٤ هـ / أغسطس ٢٠٢٢م العدد:١٠، الجزء: ٧٠
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ক্রিস্টাল মসজিদ, মালয়েশিয়া : মালয়েশিয়ার ওয়ানম্যান দ্বীপের ইসলামিক হেরিটেজ পার্কে অবস্থিত পৃথিবীর তৃতীয় সুন্দর মসজিদটি ২০০৮ সালে নির্মিত হয়। মোঘল ও ইসলামী স্থাপত্যশৈলির অপূর্ব সংমিশ্রণে ইস্পাত, কাচ ও স্ফটিক দিয়ে নির্মিত মসজিদটির আয়তন ২১৪৬ বর্গমিটার, যাতে একসঙ্গে ১৫০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে। মসজিদটিতে ৯টি বড় গম্বুজ, ৫১টি ছোট গম্বুজ ও ৪টি মিনার রয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ || ঈসায়ী ২০২২ || বঙ্গীয় ১৪২৯

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ আগস্ট	০২ মুহাররম	সোমবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৫ ,,	০৬ ,,	শুক্রবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
১০ ,,	১১ ,,	বুধবার	০৪:১১	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৭
১৫ ,,	১৬ ,,	সোমবার	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫২
২০ ,,	২১ ,,	শনিবার	০৪:১৭	০৫:৩৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৭
২৫ ,,	২৬ ,,	বৃহস্পতিবার	০৪:১৯	০৫:৩৭	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪২

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-২	০	০
নারায়ণগঞ্জ	+০	০	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	০	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৫	+৪
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	০
মাদারীপুর	+৩	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+১
শেরপুর	-১	০	+৩
জামালপুর	-১	+১	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৩	-৮
কক্সবাজার	০	-২	-১০
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৮
রাঙ্গামাটি	-৪	-৫	-৯
বান্দরবান	-৩	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	০	-১	-৪
লক্ষীপুর	+১	০	-৩
চাঁদপুর	+১	০	-২
ফেনী	-২	-২	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৭	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৫	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০
নাটোর	+৪	+৫	+৭
পাবনা	+৪	+৫	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৪	+৫	+৮
জয়পুরহাট	+৩	+৪	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৮
দিনাজপুর	+৩	+৪	+১০
গাইবান্ধা	০	+১	+৬
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৬
লালমনিরহাট	-১	+১	+৭
নীলফামারী	+১	+৩	+১০
পঞ্চগড়	+১	+৪	+১১
ঠাকুরগাঁও	+২	+৫	+১১

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৬	+২
বাগেরহাট	+৬	+৬	+১
সাতক্ষীরা	+৮	+৮	+৪
যশোর	+৭	+৭	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৮	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+৩
নড়াইল	+৬	+৫	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+২	-১
পটুয়াখালী	+৪	+৩	-২
পিরোজপুর	+৫	+৪	০
ঝালকাঠি	+৪	+৩	-১
ভোলা	+২	+১	-৩
বরগুনা	+৫	+৪	-১

৬ষ্ঠ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
আগস্ট ২০২২
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৯
মুহাররম-ছফর
১৪৪৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ **প্রধান সম্পাদক,**
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দারসে হাদীছ**
আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে করণীয় ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ **প্রবন্ধ**
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-৩) ০৫
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» মদীনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ফযীলত ০৯
-আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী

» উপেক্ষিত ধর্ম, নির্বাসিত মূল্যবোধ ১২
-ড. মো. কামরুজ্জামান

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-৯ম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১৬তম পর্ব) ১৪
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (পর্ব-৩) ১৮
-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

» জীবন যদি হতো তাদের মতো! ২২
-সাঈদুর রহমান

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান (শেষ পর্ব) ২৫
মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী (হাফেযাহুল্লাহ)
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

» আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও ফযীলত ২৭
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

» আরাফার খুৎবা ২৯
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ হযরত আলী

◈ **তরুণ প্রতিভা** ৩২
» পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার
-মো. দেলোয়ার হোসেন

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
» বাংলাদেশে বন্যার্তদের বেহাল দশা ও ইউরোপে বর্ণবাদের ভয়াবহ চিত্র ৩৫
-জুয়েল রানা

◈ **দিশারী**
» দাড়িবিহীন মুসলিম! ৩৭
-মুরতযা বিন আযহার

◈ **হাদীছের গল্প**
» কবরের প্রথম প্রহর ৪০
-উম্মে আয়মান

◈ **কবিতা** ৪২

◈ **সংবাদ** ৪৩

◈ **সওয়াল-জওয়াব** ৪৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

বন্যা : কারণ ও প্রতিকার

মহান আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা করেন ভয়-ভীতি, খাদ্যাভাব এবং জান, মাল ও শস্য-ফসলের সামান্য ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে *(দ্র. আল-বাক্বারাহ, ২/১৫৫)*। এই পরীক্ষাপদ্ধতি মহান আল্লাহর একটি চিরন্তন নীতি। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে কোন পর্যায়ের তা পরখ করে দেখতে চান। এই পরীক্ষা বিভিন্নভাবে হতে পারে, যার অন্যতম হচ্ছে— প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হানে। মূলত ১৯৫৪ সাল থেকে এদেশে বন্যার দাপট শুরু হয়। তখন থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২টি বড় ধরনের বন্যা আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে ১৭টিকে মহাপ্রলয়ংকরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা হয় ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে। বিশেষভাবে সিলেট অঞ্চলে ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালে উল্লেখযোগ্য বন্যা হয়। তবে ২০২২-এর বন্যা ব্যতিক্রম; ১২২ বছরের ইতিহাসে সিলেট ও সুনামগঞ্জে এমন বন্যা হয়নি। এতে সিলেটের সাথে সড়ক, রেল ও আকাশপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতিরিক্ত দাবদাহে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা ভারতের চেরাপুঞ্জিতে এবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। সেখানকার পানি সরাসরি বাংলাদেশের হাওড়ে এসে মিশে ভৈরব বা মেঘনা হয়ে সাগরে চলে যাওয়ার কথা থাকলেও নানা কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সিলেট বিভাগের সবকটি জেলায় প্রবেশ করে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সিলেট বিভাগের ৮০ শতাংশ এলাকা পানির নিচে চলে যায়। প্লাবিত হয় উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা। এ বছর দেশের ১৮ জেলার প্রায় ৭৬ লাখ মানুষ বন্যার শিকার হয়েছে। এ বছরের বন্যায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। ২ লাখ ৭৮ হাজার হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৬ লাখ ঘর। বন্যায় মারা গেছে ১১৬ জন মানুষ। বহু গবাদি পশুও মারা গেছে এবং প্রায় ৮ লক্ষ গবাদি পশু আশ্রয় ও খাদ্য সংকটে ভুগছে। এ বছরের বন্যায় দেশে পৌনে ৬ লাখ শিক্ষার্থী বন্যাকবলিত, যাদের শিক্ষাকার্যক্রম দীর্ঘসময় ধরে বন্ধ রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব সময় এমনি এমনি আসে না; রবং মানবসৃষ্ট নানা প্রেক্ষাপট ও কারণ তৈরি হওয়ার মাধ্যমে আসে। মানুষের কার্যকলাপের কারণে সংঘটিত জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ভারী বর্ষণ ঘটে চলেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নগরায়ণের ফলে জলাভূমি ভরাট হওয়া, নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়া, নদ-নদী অপদখলে চলে যাওয়া, হাওড়ের মাঝখানে রাস্তা বানিয়ে পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা, নদীগুলো ড্রেজিং না করা ইত্যাদি কারণে এসব অতিবৃষ্টির পানিপ্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে তা বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফসল, সম্পদ, ঘরবাড়ির পাশাপাশি মানুষকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বন্যার জন্য ভারত মোটেও দায় এড়াতে পারে না। বরং দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশ ভারতের পানি আগ্রাসনের শিকার। আর্ন্তজাতিক আইন, প্রতিবেশির অধিকার সবকিছুকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাংলাদেশের ৫৪টি নদীর উৎসমুখে ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধসহ একাধিক বাঁধ ও ড্যাম নির্মাণ করে বাংলাদেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করছে ভারত। বর্ষাকালে আমাদেরকে পানিতে ভাসিয়ে মারছে আর খরায় পানি আটকে দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানিয়ে দিচ্ছে। একসময় এদেশে ১২০০ নদীর কথা শোনা যেত, কিন্তু এখন ২০০ নদীও সচল নেই। সব শুকিয়ে মরা খালে পরিণত হয়েছে। অনেকগুলোর চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯৭১ সালের রেকর্ড অনুযায়ী ২৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ কমে এখন ৬ হাজার কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি ধ্বংস হয়েছে। সেচের পানির অভাবে কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে জমির উর্বরাশক্তি কমে গেছে এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের প্রায় ১৭ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের একপেশে নীতির কারণে আরো যে কত ক্ষতি আমাদের হয়েছে, তার হিসাব কয়জনে রাখে!

এক্ষণে— (১) আমাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরে আসতে হবে। যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং ঈমানের উপর টিকে থাকতে হবে। (২) বানভাসী মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের তড়িৎ পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া হাতে হবে। (৩) কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ করা যায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। (৪) বাংলাদেশের নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং তা ধরে রাখার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। (৫) ভারতের পানি আগ্রাসন বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ভাটির দেশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর উৎস দেশের ভূ-সীমানার বাইরে থাকায় অভিন্ন নদীগুলোর গতিপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে প্রতিবেশি দেশ ভারতের সঙ্গে এমন গঠনমূলক উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে তা কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। (৬) যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণ করে পানির প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ বন্ধ করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় বালা-মুছীবত থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে করণীয়

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ.

সরল অনুবাদ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে আমার ওলী (বন্ধু) এর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমার বান্দার উপর আমি যে বিধান ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকলে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার সে কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শোনে; আমি তার সে চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে; আমি তার সে হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি সে পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার নিকট কোনো কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তা তাকে দান করি আর আমার নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাইলে তাকে মুক্ত করে দিই’।[১]

ব্যাখ্যা : এই হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত মানুষকে নিয়ে কথা বলেছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা গভীর ভালোবাসা দিয়ে বাছাই করেছেন, স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা যাদেরকে নৈকট্য দান করেছেন। যারা সৌভাগ্য ও সাফল্যের উপকরণকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিজয় লাভের জন্য নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন এবং সব ধরনের পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে নিজের আত্মাকে পবিত্র করেছেন। দীর্ঘ সময় আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মগ্ন থাকতে তাদের দেহ কখনই কষ্ট পায় না। ফলে তিনি তাদেরকে আধ্যাত্মিক নূরের আলোয় আলোকিত করেন এবং এমন মর্যাদা দান করেন, যা অন্য কাউকে করেন না। সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে তিনি তাদেরকে প্রকৃত ওলী (বন্ধু) এর জায়গায় অধিষ্ঠিত করেন। প্রকৃত অর্থে এরাই হলেন আল্লাহ তাআলার আওলিয়া বা সবচেয়ে নিকটতম বান্দা।

এরা এমন শ্রেণির মানুষ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রবৃত্তি ও পথভ্রষ্টতার পদস্খলন থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে রেখেছেন। তিনি তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা ও সৌভাগ্যের সুব্যবস্থা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ‘মনে রেখো! যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং ভয় করে’ *(ইউনুস, ১০/৬২-৬৩)*। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং ভরসা রাখে, তাদের কি কোনো ভয় থাকতে পারে? ভয় থাকতে পারে না। যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে, ঈমান তাদের হৃদয়ে সৎকর্মের প্রতি অনুপ্রেরণা, অন্তরে প্রশান্তি ও গভীর আস্থা সৃষ্টি করে।

মর্যাদা ও সম্মানের বিচারে তারা এমন উচ্চতায় পৌঁছেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের অনিষ্ট কামনা ও ক্ষতিসাধনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম’।[২]

সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন, কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর ওলী ও বন্ধুদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। কীভাবে তিনি স্বীয় সমর্থন ও সাহায্য দ্বারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন? অতঃপর লক্ষ্য করুন, তাদের শত্রুদের কীভাবে যুদ্ধের ভয় প্রদর্শন করছেন! যখন আপনি জানতে পারেন তিনি তাদের থেকে দূরে সরে আসেন না কিংবা তাদেরকে শত্রুর শিকার হতে দেন না, তখন আপনি অনুধাবন করবেন তাদের জন্য আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্য অবশ্যই আসবে- যদিও তা দেরিতে কিংবা দীর্ঘ অপেক্ষার পর আসে। এই সাহায্য ও সমর্থন আল্লাহ তাআলার শাশ্বত ও সত্য বিধান। কখনও এর পরিবর্তন বা ব্যত্যয় ঘটে না। তাঁর শাশ্বত বিধানের দাবি হলো অত্যাচারীকে সাময়িক অবকাশ দেওয়া তবে উদাসীনতা নয়।

কিন্তু তারা যদি তওবা করে ও অন্যায় থেকে ফিরে আসে এবং সৎকর্মপরায়ণশীলদের প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে, তবে তিনি তাদেরকে তওবা করার সুযোগ দান করেন। আর যদি তারা ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে আর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকে, তবে তিনি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে অবকাশ দিতে থাকেন। এভাবে যখন তারা অবাধ্যতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর ক্ষমতা ও অসীম শক্তি দেখান এবং কঠিনভাবে পাকড়াও করেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর আওলিয়ার বিজয় দান করেন, তাদের কল্যাণকর পরিণাম নিশ্চিত করেন এবং বিরোধীদের উপর তাদের বিজয়ী করেন।

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

আওলিয়ার এই স্তরে পৌঁছা বড় সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং অফুরন্ত নিয়ামতে ধন্য হওয়ার বিষয়। বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা, তাকে তিনি এই বিরল সম্মানে ভূষিত হওয়ার সুযোগ দান করেন। কোনো পথ অবলম্বন করলে মর্যাদার এই উচ্চ আসনে সমাসীন হওয়া যায়, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক।

আল্লাহর নবী নিম্নের বাক্যে আওলিয়ার প্রথম স্তর বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহর ভাষায় বলেন, ফরযকৃত বিধানের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এই স্তরে পৌঁছা ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে উবূদিয়াতের (দাসত্ত) সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। প্রথমত, যে নির্দেশনা তাকে প্রদান করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা এবং এমন সীমালঙ্ঘন ও হারাম বর্জন করা, যা এই স্তরে পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়।

অতঃপর সে এর থেকে উঁচু ও উন্নততর স্তরে পৌঁছে যায়। আর তা হলো নফল ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং উভয় জগতে কল্যাণ লাভের আশায় রবের দরবারে বারবার আবেদন করা। সে এ অবস্থায় উন্নতির এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, সে এর সুধা পান করে তৃপ্তি পায় আর আল্লাহর গভীর ভালোবাসায় ধন্য হয় অর্থাৎ সে ইহসানের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যার বিবরণে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ; যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে এমনটা ভাববে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৩]

এই পর্যায়ে একজন মুমিনের অবস্থা দারুণ আবেগময় থাকে। কারণ, তার হৃদয় তার রবের ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে, সে তাঁর সাক্ষাতের জন্য চরম উৎসুক থাকে। তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভয় তাকে সর্বদা অস্থির ও উদ্বিগ্ন রাখে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের মহিমায় তিনি অবগাহন করেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হতে পারে, যে তার রবের সামনে অবস্থান করে এবং দিব্যচক্ষে তাঁকে অবলোকন করে? সুতরাং যিনি বিশ্বাসের এই স্তরে পৌঁছেছেন, তার ঈমান কত গভীর তা কেবল তিনিই অনুধাবন করতে পারেন, যিনি উক্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

যখন কোনো মুমিন ইবাদতের প্রতি মুহূর্তে তার রবের অনুপ্রেরণা লাভ করে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনায় মুগ্ধ থাকে, তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে না। তাঁর কানে আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কোনো শব্দ পৌঁছায় না। কল্যাণ ব্যতীত কোথাও তার দৃষ্টি পতিত হয় না। আল্লাহর পছন্দ ছাড়া কোথাও তার পদচারণ হয় না। আল্লাহর নিম্নবক্তব্যে উক্ত মর্মার্থ খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে- 'যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার সে কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শোনে; আমি তার সে চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে; আমি তার সে হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার সে পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে হাঁটে'।[৪] তাই যে বান্দা উক্ত স্তরে পৌঁছে যায়, আল্লাহ তার দু'আ সরাসরি কবুল করেন, তার আবেদন তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করেন। প্রত্যেক ক্ষতিকর অবস্থা থেকে তাকে রক্ষা করেন এবং শত্রুর উপর বিজয় দান করেন।

সুধী পাঠক! আল্লাহর আওলিয়ার কিছু সত্য ঘটনা, তাদের বাস্তব জীবনের কিছু কাহিনী তুলে ধরা হলো। আলী ইবনু আবি ফোযারাহ রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা ২০ বছর ধরে ল্যাংড়া ছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। তিনি একদিন আমাকে আহমাদ ইবনু হাম্বলের নিকট যেতে বললেন, আমি তার বাসায় এসে দরজায় নক করলে তাকে বারান্দায় দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি এমন একজন অসুস্থ মায়ের সন্তান, যিনি পায়ের সমস্যার কারণে চলাফেরা করতে পারেন না। তিনি আপনার নিকট দু'আ চেয়েছেন। আলী ইবনু আবি ফোযারা রাহিমাহুল্লাহ বলল, আমি তার কথায় বুঝতে পারলাম, তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত। তিনি বললেন, আমরা তোমাদের দু'আর বেশি মুখাপেক্ষী। আমি তার বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। তখন এক বৃদ্ধা বের হয়ে বলল, আমি তাকে তোমার মায়ের জন্য দু'আ করতে দেখলাম। আমি বাসায় এসে দেখি আমার মা পায়ে হেঁটে আমার নিকট বেরিয়ে আসলেন।[৫]

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবি জা'ফর রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। অতঃপর আমাদের নৌকা ভেঙে গেল। সমুদ্র তরঙ্গ আমাদেরকে ভাসমান একটি কাঠের উপর নিক্ষেপ করল। আমরা পাঁচ অথবা সাত জন ছিলাম। আমাদের সংখ্যানুযায়ী আল্লাহ আমাদের জন্য সমুদ্রে উদ্ভিদ জন্ম দিলেন। আমরা ঐ উদ্ভিদের পাতা পেট পূর্ণ করে খেলাম এবং পরিতৃপ্ত হলাম। অতঃপর সন্ধ্যা হলে আল্লাহ আমাদের জন্য সমুদ্রে একটি চর তৈরি করলেন, যেখানে আমরা রাত্রি যাপন করলাম। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আমাদের জলযানটি ঠিক হয়ে গেল এবং আমরা জলযানে বাসায় ফিরে আসলাম।[৬]

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব আল-কুরআনে আওলিয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ওলীগণ রবের গভীর ভালোবাসায় মুগ্ধ থাকেন। দুনিয়ার জীবনের প্রাপ্তি, সাফল্য, ভোগ কোনো কিছুই তাকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'মনে রেখো! যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং ভয় করে' *(ইউনুস, ১০/৬২-৬৩)*। এখান থেকেই আহলে ইলমদের কেউ কেউ বলেছেন, যে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং একমাত্র তাকেই ভয় করে, সেই প্রকৃত ওলী হওয়ার যোগ্য।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

৫. হাফেয আয-যাহবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/২১১।

৬. মাহমূদ ইবনে আহমাদ, মাগানীল আখয়ার, ৩/৩০৮।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী**

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী***

(পর্ব-৩)

লেখকের ভূমিকা

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلٰه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর সময় মুসলিমগণ দ্বীনের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত (أصول الدين وفروعه) সকল বিষয়ে একই মানহাজের উপর ছিলেন। তবে কেউ প্রকাশ্যে ঐক্য দেখিয়ে ভেতরে নিফাক্বী লুকিয়ে রাখলে তার ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন’।[১] ‘এভাবে আবূবকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পুরো শাসনামল জুড়ে এবং উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলের প্রথমাংশে তারা সকলে একতাবদ্ধই ছিলেন; তাদের মধ্যে কোনো প্রকার বিভক্তি ছিল না। তারা কুরআন ও ঈমানের উপর দৃঢ় ছিলেন। যে মূলনীতির উপর ভর করে তারা মযবূত ভিত্তি রচনা করেছিলেন, তা ছিল নিম্নবর্ণিত আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ— ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ *(আল-হুজুরাত, ৪৮/১)*। ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ ‘তারা (ফেরেশতাগণ) তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেন না এবং তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করেন’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/২৭)*। ফলে আল্লাহ তাআলা না জানানো পর্যন্ত তারা তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্য বা অন্য কোনো ব্যাপারে সংবাদ পরিবেশন করেন না। সেজন্য তাদের সংবাদ ও বক্তব্য তাঁর সংবাদ ও বক্তব্যের অনুগামী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তাদের আমলও তাঁর নির্দেশের অনুগামী হয়ে থাকে।

ঠিক এমনই ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পথের যথাযোগ্য অনুসারী তাবেঈ ও মুসলিম ইমামগণ। সেকারণে তাদের কেউ তার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীছের বক্তব্যের বিরোধিতা করেননি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন তারা প্রতিষ্ঠিত করেননি। দ্বীনের কোনো ব্যাপারে যখন তারা জানতে চেয়েছেন এবং মন্তব্য করতে চেয়েছেন, তখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেছেন। সেখান থেকেই তারা শিখেছেন, এর মাধ্যমেই মন্তব্য করেছেন, এর প্রতিই গভীর মনোযোগ দিয়েছেন এবং এর দ্বারাই দলীল উপস্থাপন করেছেন। **এটা আহলুস সুন্নাহ-এর অন্যতম মূলনীতি**’।[২]

পরবর্তীতে ইখতেলাফ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে; মূলে যা ছিল ছোট, তারপর বাড়তে বাড়তে বড় ও বিপজ্জনক হয়ে গেছে!

বিভক্তি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য দ্বারা নিন্দিত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ ‘আর যারা কিতাবে মতভেদ করেছে, তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৬)*। তিনি আরো বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ ‘যারা তাদের দ্বীন বিষয়ে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব আপনার নেই’ *(আল-আনআম, ৬/১৫৯)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ ‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিভক্ত হয়েছে এবং মতভেদ সৃষ্টি করেছে’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৫)*। তিনি বিভক্তদের চরিত্র উল্লেখ করে বলেন, ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ‘প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত’ *(আর-রূম, ৩০/৩২)*।

---

* বইটির লেখক আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল-আছারী (জন্ম : ১৩৮০ হিজরী) একজন ফিলিস্তীনী সালাফী আলেম। তিনি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শায়খ আলবানী, শায়খ ইবনে বায, শায়খ বাকর আবূ যায়েদ, শায়খ মুক্ববিল ইবনে হাদী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম শায়খ আলী আল-হালাবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ আলোচক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

** বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. বাগদাদী, আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক, পৃ. ১৪।

২. ‘বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ’ গ্রন্থের উপর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম প্রণীত ভূমিকা থেকে গৃহীত, ১/৫।

‘এই বিভক্তি ও মতভেদ শিরক অবধারিত করে তোলে[৩] এবং তাওহীদের মর্মার্থের বিরুদ্ধে যায়; যে তাওহীদের মূলকথা হচ্ছে, দ্বীনের পুরোটাই কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করতে হবে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ ‘তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখো’ *(আর-রূম, ৩০/৩০)*। আর একনিষ্ঠভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করলে এবং শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদত করলেই পুরো দ্বীন আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে থাকে। আর এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর আদিষ্ট সকল বিষয়ের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্তি।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ ‘আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে’ *(আর-রূম, ৩০/৩১-৩২)*। এর ব্যাখ্যা এরকম— দ্বীন যদি পুরোটাই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন এবং যা কিছু দিয়ে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তার সবগুলোর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য বাস্তবায়িত হবে। **আর এটা সমস্ত হক্বকে একত্রিত করে এবং সমস্ত হক্ব এখানে একত্রিত হয়।** কিন্তু দ্বীন যদি পুরোটাই আল্লাহর জন্য না হয়, তাহলে প্রত্যেক দলের পৃথক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা অবধারিত হয়ে যায়। যেমন— সম্মাননীয় অনুকরণীয় কেউ বা কোনো মা‘বূদ থাকা অবধারিত হয়ে যায়, যার ইবাদত ও আনুগত্যের নির্দেশ মহান আল্লাহ দেননি। অনুরূপভাবে মানুষের বানানো কোনো মতবাদ বা দ্বীন থাকা অবধারিত হয়ে যায়, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি এবং তিনি তার বিধানও দেননি’।[৪]

বিভিন্ন হাদীছে এই বিভক্তির কথা বিভিন্নভাবে এসেছে, যা আমাদেরকে নিশ্চিত জানান দেয় যে, এই বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী। যেমন— রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ﴿إِنَّ بنى إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً﴾ ‘বানূ ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত অচিরেই ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে’।[৫]

কেউ বলতে পারে, বিভক্তি যেহেতু পূর্বনির্ধারিত, তাহলে তা তো ঘটবেই এবং সেখান থেকে পালাবারও তো কোনো পথ নেই?! শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এই যে মতপার্থক্যের কথা হাদীছগুলোতে এসেছে, তা মূলত মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ ‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতভেদ সৃষ্টি করেছে’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৫)*। তিনি আরো বলেন, ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ ‘নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না’ *(আল-আনআম, ৬/১৫৩)*। এ প্রকার মতভেদ ছহীহ মুসলিমের[৬] নিম্নবর্ণিত হাদীছের সাথেও মিলে যায়— আমের ইবনে সা‘দ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর কতিপয় ছাহাবীসহ আলিয়া অঞ্চল হতে আগমন করলেন। তিনি বানূ মুআবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের সন্নিকটে এসে সেখানে প্রবেশ করলেন এবং দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে ছালাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দীর্ঘ সময় দু‘আ করলেন এবং দু‘আ শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। তারপর তিনি বললেন, ‘আমি আমার প্রতিপালকের কাছে ৩টি বিষয় প্রার্থনা করেছি। তন্মধ্যে তিনি আমাকে দু’টি প্রদান করেছেন এবং একটি প্রদান করেননি। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম, যেন তিনি আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু‘আ কবুল করেছেন। তাঁর নিকট এও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু‘আও কবুল করেছেন। আমি তার নিকট এ মর্মেও দু‘আ করেছিলাম যে, যেন মুসলিমরা একে অপরের বিপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আমার এ দু‘আ কবুল করেননি’।

নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত এ হাদীছটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বিভক্তি ও বিভেদ অবশ্যই ঘটবে। তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করতেন, যাতে আল্লাহ যার নিষ্কৃতি চান, সে বিভেদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। নাযযাল ইবনে সাবরাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত পড়তে শুনলাম, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অন্যভাবে পড়তে শুনেছি। ফলে আমি তার হাত ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বিষয়টি তাঁকে বললাম। এতে তাঁর চেহারায় অপছন্দের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, ‘তোমরা উভয়েই ঠিক পড়েছো। তোমরা মতভেদ করো না। কেননা তোমাদের

---

৩. বিভক্তি সরাসরি শিরক অবধারিত করে না, তবে তাতে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া মুসলিমদের মধ্যকার বিভক্তির যে ফলাফল, মুশরিকদের মধ্যকার ফলাফলও ঠিক তা-ই। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৪. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ, জামে‘উর রসাইল (তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ রশাদ সালেম), ২/২৩০।

৫. হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটির অনেক সনদ রয়েছে, যা আমি ‘কাশফুল গুম্মাহ ‘আন হাদীছি ইফতিরাক্বিল উম্মাহ’ শিরোনামের আলাদা একটি পুস্তিকায় সংকলন করেছি। আমার এ কিতাবটি দ্রষ্টব্য: ‘আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস’, পৃ. ৩২, (দারু ইবনিল জাওযী)।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২২১৬।

www.al-itisam.com

পূর্ববর্তীরা মতভেদ করে ধ্বংস হয়েছে’। হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[৭]

জেনে রাখুন, উম্মতের অধিকাংশ মতভেদ, যা প্রবৃত্তিপ্রীতির জন্ম দেয়, তা এই প্রকারের। এ প্রকারের মতভেদে দু’জন মতভেদকারীর একজন যা সাব্যস্ত করতে চায়, সে ব্যাপারে সে সঠিক থাকে, কিন্তু অন্যের যে ব্যাপারটি নাকচ করতে চায়, সে ব্যাপারে সে বেঠিক থাকে। উভয়ের পক্ষ থেকে এই নিন্দনীয় মতভেদের কারণ কখনও হয়ে থাকে খারাপ মন-মানসিকতা। কারণ সে হৃদয়গহীনে হিংসা, বিদ্বেষ, পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারের অভিলাষ ইত্যাদি লুকিয়ে রাখে। ফলে সে অন্যের কথা বা কাজের নিন্দা করতে অথবা অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে ভালোবাসে। অথবা সে সেই ব্যক্তির কথা পছন্দ করে, যে তার সাথে বংশ, মাযহাব, এলাকা, বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো কারণে একমত হয়। কারণ ঐ ব্যক্তির কথা বাস্তবায়ন করলে তার মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের সম্ভাবনা থাকে। **আদমসন্তানের মধ্যে এটা কতই-না বেশি! এটা আসলে যুলম।**

মতভেদের আরো কারণ হয়ে থাকে মতভেদের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা বা দলীল সম্পর্কে অজ্ঞতা, যে দলীল দিয়ে একজন অপরজনকে পথ দেখাতে চাচ্ছে। অথবা একজনের কাছে হুকুম বা দলীলের ক্ষেত্রে যে হক রয়েছে, সে সম্পর্কে অপরজনের অজ্ঞতা, যদিও সে হুকুম বা দলীলের ক্ষেত্রে তার নিজের কাছে থাকা হক সম্পর্কে সে ওয়াক্বিফহাল। আসলে মূর্খতা ও যুলম সকল অনিষ্টের মূল”।

অতএব, মতভেদ ও বিভেদ পূর্বনির্ধারিত মনে করে উম্মতের বিভেদে সন্তুষ্ট থাকা ইবলীসের সামগ্রিক ধোঁকা।

যখন নিকৃষ্ট রাষ্ট্রীয় হিংস্র আক্রমণ দ্বারা ইসলামী খিলাফতের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিচারব্যবস্থা থেকে আল্লাহর কিতাব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, খেলাফতের অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিরোধপূর্ণ ছোট ছোট দেশে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয়েছে, তখন এই মতভেদ, এর ভয়াবহতা ও লেলিহান শিখা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। তারপর বানর-শূকরের ভাইদের (إخوان القردة والخنازير) বীজ বপন করে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের বুকে খঞ্জর চালানো হয়েছে এবং তা সম্পন্ন হয়েছে স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম –এর ইসরার দেশেই।

সেই সময় থেকে মুসলিমরা এমন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, যার মাধ্যমে তাদের হৃত মর্যাদা পুনরায় ফিরে আসতে পারে এবং তাদের কণ্ঠ আবার উঁচু হতে পারে। কিন্তু কিছুতেই তারা তা খুঁজে পাচ্ছিল না। ইত্যবসরে তাদের অনেকেই এমন কিছু জোট, দল ও জমায়েত তৈরি করতে চাচ্ছিল, যেগুলো হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার ও কাঙ্ক্ষিত আশা তৈরির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিতে পারে। এর কারণে জন্ম হলো দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কল্যাণের!!

বিপরীতে এর মাধ্যমে অকল্যাণও জন্মলাভ করল, যা দংশিতের দেহে বিষধর সাপের বিষের ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছিল, যার প্রকাশ্য কোনো রূপ ছিলো না। অবশেষে সেই অকল্যাণ আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে গেল, যেন তা কখনই সংশোধনযোগ্য নয়। বাস্তবতা কিন্তু এমনই।

সেই সময় কতিপয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সজাগ হয়ে এসব জমায়েত থেকে সাবধান করতে লাগলেন, যেসব জমায়েতের বহির্ভাগে করুণা দেখা গেলেও আসলে অভ্যন্তরে রয়েছে আযাব। কারণ মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে দলে দলে বিভক্ত হয়ে দলের ভিত্তিতেই মিত্রতা ও শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করে। দলীয় সম্প্রীতিই তাদের নিকট মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়, এর বাইরে যেন আর কিছুই বাকী থাকে না! সেজন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আপনি তাদেরকে হক্বের পাঁচ পয়সাও মূল্য দিতে দেখবেন না- যদি তা আসে নিজ দল ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে বা নিজের দাওয়াতী রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা থেকে!! এসব কারণেই বিভিন্ন সময়ে এসব দলকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার আওয়াজ উঠেছে! আসলে তারা যেন সাগরের বুকে চাষ করতে চাচ্ছে!! কারণ তারা ভুলেই গেছে বা ভুলার ভান করেছে যে, ‘সকলকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে আক্বীদা ও মানহাজ এক না থাকা, নিন্দনীয় মতভেদ বিদ্যমান থাকা, দলের জন্য অন্ধভক্তি থাকা এবং দলীয়করণের মানসিকতা থাকা’।[৮]

ফলে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার যে মহান লক্ষ্যে বিভিন্ন জামাআত, দল ও জমায়েত গঠন করা হয়েছিল, তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ অসীলা বা মাধ্যম এখন পরিবর্তিত হয়ে মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, ব্যাখ্যা ও বাস্তবতা উল্টে গেছে...

আল্লাহর শত্রুরা আসলে এটাই চায়। তারা রাত-দিন ‘স্বাধীনতা’, ‘গণতন্ত্র’ ইত্যাদি বলে চিল্লায়, যা মানুষের কানে কানে ভেসে বেড়ায় এবং শুনতে বেশ ভালোই মনে হয়। কিন্তু তারা আসলে এসব দলবাজি দ্বারা উম্মতকে আরো বেশি বিভক্ত করতে চায়।

এসব শত্রু যদি জানত বা অনুভব করত যে, এসব দল ও জামাআতের মধ্যে উম্মতের জন্য কল্যাণ আছে, তাহলে তারা এগুলোকে নিষিদ্ধ করত এবং এগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামত। তারা আসলে নিশ্চিতভাবে জানে যে, এগুলো

---

৭. শায়খুল ইসলাম এভাবেই বলেছেন। আসলে হাদীছটি ইমাম বুখারী (হা/২৪১০) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: তুহফাতুল আশরাফ, ৭/১৫২।

৮. মাজাল্লাতুল ফুরকান আল-কুয়েতিয়্যাহ, সংখ্যা: ১৩, পৃ. ৪৬। এখানে সম্পাদক একটি বক্তব্যের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমাদের ভাই শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমেরিকার জমঈয়াতুল কুরআন ওয়াস-সুন্নাহর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে আলোচনা করেছিলেন।

উম্মতকে বিভক্ত করে ও তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে; সেজন্য তারা বরং এগুলোকে উৎসাহিত করে এবং এগুলো বৃদ্ধি ও একজন আরেকজনকে মারার জন্য কাজ করে। ফলে কিছুদিন বিরতিতেই আমরা নতুন নতুন দল ও জামাআত গঠিত হতে শুনি।

মুসলিমরা কি এই আপতিত বিপদের ব্যাপারে সাবধান হবে না, যা তাদেরকে বন্ধুরূপে প্রতিনিয়ত হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, অথচ তা ঘোরতর শত্রু!!

এমনকি একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ন্যূনতম অধিকারটুকু আমরা বর্তমান দলীয় লোকজনের মধ্যে হারাতে দেখতে পাচ্ছি। 'যে সময়ে মুসলিমরা মাযহাবী গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছে, সে সময়ে বিভিন্ন দল ভিন্নরূপে আরো মারাত্মকভাবে গোঁড়ামিকে উসকে দিতে শুরু করেছে'।[৯]

"আল্লাহু আকবার... একজন মুসলিম তার নিজের জন্য এটা কীভাবে মেনে নিতে পারছে যে, সে তার জামাআত ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম ভাইয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে 'আস-সালামু আলাইকুম'টুকু পর্যন্ত বলতেও কার্পণ্য করছে?! কিন্তু কেন?! এমনকি যদি আপনাকে এ নির্দেশনাও দেওয়া হয় যে, অমুককে সালাম দিবেন না!! (তবুও আপনি সেই নির্দেশনা মানতে পারেন না)। কেননা এ নির্দেশ সরাসরি শরীআতবিরোধী। ফলে এটা পাপের নির্দেশ, যা মানা যাবে না। ব্যাপারটা ঐ তিন ব্যক্তির ঘটনার সাথেও তুলনা করা যাবে না, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। কারণ তা হয়েছিলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে। সুতরাং তা ছিল খাছ বা বিশেষ বিষয়।

আল্লাহু আকবার... কীভাবে একজন মুসলিম একজন ফক্বীহ-এর ক্লাস বর্জন করতে পারে, তার কাছে বসা বন্ধ করতে পারে?! কীভাবে এটা সম্ভব?! কারণ তিনি তার জামাআতের নন!!

আল্লাহু আকবার... কীভাবে কোনো একটি আন্দোলনের লোক (بعض الحركيين) অন্যান্য দলের লোকদের এমনভাবে নিন্দা করতে পারে, যেন সেগুলো ইসলামী দলই নয়?!

আল্লাহু আকবার...শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের সম্প্রীতিকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার বৈধতা কে দিল, অথচ ইসলাম ও মুসলিমদের দরকার আছে এমন প্রত্যেকটি সেবার জন্যই ভালোবাসা ও সম্প্রীতি থাকা জরুরী?!

যতটুকু উল্লেখ করেছি, তা প্রসিদ্ধ বিষয়; এটাকে অস্বীকার ও লুকানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না"।[১০]

এভাবে কত দিন চলবে?!

(চলবে)

৯. বাকর আবূ যায়েদ, হুকমুল ইনতিমা, পৃ. ১৪৫।

১০. শায়খ আব্দুর রঊফ আল-আব্বূশী, আল-জামাআত আল-ইসলামিয়্যা : লায়তাহা তুযীফু ইলা হাসানাতিহা, পৃ. ১৬।

বন্ধ্যাত্ব, ব্যথা, ক্যান্সার
পাইল্‌স, পাথুরি, আইবিএস, টিউমার এবং অন্যান্য জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা
হোমিও মেডিসিন ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন সরকার
বি.এইচ.এম.এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এম.পি.এইচ (পুন্ড্র বিশ্ববিদ্যালয়), ডি.এম.ইউ (বি.টি.ই.বি, ঢাকা)
সি.সি.পি (বি.এন.এম.সি, ঢাকা), সি.এ.এম (বি.ইউ.এ.বি, ঢাকা), উচ্চতর প্রশিক্ষণ (ভারত)
সহযোগী অধ্যাপক, রংপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, রংপুর
প্রাক্তন হাউজ ফিজিশিয়ান, গভ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা
রংপুর চেম্বারঃ রুহুল হোমিও সেন্টার
পি.বি রোড, জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর। সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত (রবি থেকে বৃহস্পতিবার)
গাইবান্ধা চেম্বারঃ রাইয়ান হোমিও সেন্টার
বড় মসজিদের সামনে, পুরাতন বাজার, গাইবান্ধা। সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, (প্রতি শনিবার)
সিরিয়ালঃ 01767 222 000

মদীনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ফযীলত

-আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী*

পবিত্র মদীনা নগরী মুসলিম উম্মাহর কাছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ শহর। মুসলিমহৃদয়ে এই নগরীর প্রতি রয়েছে অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মর্যাদা। কেননা এখানেই শুয়ে আছেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ। পবিত্র এই ভূমিতেই ইসলামের উত্থান হয়েছে এবং এখান থেকেই সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন রাসূল ﷺ। তিনি তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শেষ ১০ বছর এই নগরীতেই কাটিয়েছেন। মূলত আল্লাহ এই নগরীকে ইসলামের জন্য কবুল করেছেন। মদীনা শহরের উত্তরে উহুদ পাহাড়, দক্ষিণ-পশ্চিমে আইর পাহাড় অবস্থিত। মদীনায় রয়েছে অসংখ্য উপত্যকা। উল্লেখযোগ্য উপত্যকা হলো- বাতহান, মাহরূয, আকিক প্রভৃতি। মদীনায় ইসলাম উত্থানের পূর্বে প্রথম অধিবাসী ছিলেন— আমালিকা সম্প্রদায়, এরপর ইয়াহূদীরা শাম থেকে এবং বায়তুল মাক্বদেস থেকে ১৩২-১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় হিজরত করে আসেন। তাদের আসার কারণ হলো— তাদের উপর রোম সম্রাট আক্রমণ করে তাদেরকে উচ্ছেদ করেন।

মদীনার আশেপাশে ইয়াহূদীদের প্রসিদ্ধ গোত্র বানু কুরাইযা, বানু কাইনুকা ও বানুন নাযীর বসবাস করত।[১] অন্যদিকে ২০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামান থেকে হিজরত করে খাযরাজ ও আউস মদীনায় এসে বসবাস শুরু করেন।[২] ইয়াহূদী সম্প্রদায় ইসলাম প্রত্যাখ্যানসহ ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় বানু কুরাইযার পুরুষদের হত্যা করা হয়। আর বানু কাইনুকা এবং বানুন নাযীরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তবে খাযরাজ ও আউস ইসলাম কবুল করেন এবং তারাই রাসূল ﷺ-কে মদীনায় হিজরতের আমন্ত্রণ জানান। নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছলে তারাই তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এমনকি ইসলামের সকল যুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা ইসলামে আনছার ছাহাবা হিসেবে খ্যাত। তাঁরা তাদের ঘরবাড়ি, স্ত্রী, সম্পত্তি সবকিছু মুহাজির ছাহাবীগণের জন্য উৎসর্গ করেন। মক্কা থেকে হিজরতকারী ছাহাবীগণের সঙ্গে তাদের অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ও তাদের কর্মে সন্তুষ্ট (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)।[৩]

রাসূল ﷺ দুই ইয়াতীম সন্তান সাহল ও সুহাইলের কাছ থেকে মসজিদে নববীর জায়গা ক্রয় করে নিয়ে মসজিদ তৈরি করেন। রাসূল ﷺ-এর যামানা এবং পরবর্তী তিন খলীফা আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সময়কালে মদীনা মুনাওয়ারা মুসলিম জাহানের রাজধানী ছিল। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ৩৬ হিজরীতে কূফায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। এরপর আর মদীনায় মুসলিম জাহানের রাজধানী ফিরে আসেনি।

মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ৪১ হিজরীতে খেলাফত লাভ করলে তিনি মুসলিম জাহানের রাজধানী হিসেবে দামেস্ক নির্ধারণ করেন। প্রায় ৯০ বছর পর্যন্ত দামেস্ক মুসলিম জাহানের রাজধানী ছিল। এই দীর্ঘ সময় মদীনা মুনাওয়ারা উমাইয়া শাসন ব্যবস্থার অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল। উমাইয়া শাসক ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া মদীনায় ৬৩ হিজরীতে সেনাপতি মুসলিম ইবনু উক্ববা আল-মুররির নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কারণ মদীনাবাসীরা ইয়াযীদের হাতে বায়আত নেওয়া থেকে বিরত ছিল। অতঃপর মদীনাবাসীদের প্রতি বায়আতের আহ্বান জানালে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন, এতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে।[৪]

উমাইয়া শাসক খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক ৮৮ হিজরীতে মদীনার গভর্নর হিসেবে উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লা-হু)-কে নিয়োগ দেন, তাঁর শাসনামলে মসজিদে নববী ব্যাপক প্রশস্ত করা হয়। সেসময় নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের

---

* বি.এ. (অনার্স), এম.এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; শিক্ষক, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

১. ড. জাওয়াদ, আল-মুফাছছাল ফী তারিখুল আরাব ক্বাবলাল ইসলাম, ৬/৫১৩-৫১৪।

২. ড. জাওয়াদ, আল-মুফাছছাল ফী তারিখুল আরাব ক্বাবলাল ইসলাম, ২/২৮৫।

৩. বালাযারী, আনসাবুল আশরাফ, ১/২৭০; ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, আস-সিরাতুন নাববিয়া ছহীহা, ১/২৪০-২৪৮।

৪. আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩/২১৩-২২৫; আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, ১১/৬৫০-৬৬০।

ঘরবাড়ি ভেঙে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫] ১৩২ হিজরীতে আব্বাসীয়দের উত্থান ঘটে। তারা বাগদাদ রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ১৩২ থেকে ৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত মুসলিমজাহান শাসন করেন। তাদের এই দীর্ঘ প্রায় ৫২৪ বছর শাসনামলে মদীনা অন্যতম প্রদেশ হিসেবেই ছিল। আব্বাসীয়দের ৬৫৬ হিজরীতে পতন ঘটলে মামলূকীদের উত্থান ঘটে। তারা ৬৪৮ হিজরী থেকে ৯২৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ২৭৫ বছর ফিলিস্তীন, সিরিয়া ও মিশর শাসন করেন। হিজায তথা মক্কা, মদীনা, তায়েফ অঞ্চলের প্রতি মামলূকীদের নজর বেশ ভালোই ছিল। এসময় মামলূকীরা মদীনায় প্রসিদ্ধ যে বিদআত শুরু করে, তাহলো রাসূল ﷺ-এর কবরের উপর গম্বুজ তৈরি।

মামলূকী সুলতান মানছূর কালাউন ছালেহী ৬৭৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর কবরের উপর কাঠের গম্বুজ তৈরি করেন। প্রায় ১০০ বছর পর ৭৬৫ হিজরীতে হাসান ইবনু মুহাম্মাদ গম্বুজ সংস্কার করেন। এরপর আবার প্রায় ১০০ বছর পর ৮৮১ হিজরীতে মামলূকী সুলতান ক্বাইতবাই গম্বুজ সংস্কার করেন। ৮৮৬ হিজরীতে মসজিদে নববীতে আগুন লাগলে গম্বুজের ক্ষতি হলে পুনরায় সুলতান ক্বাইতবাই ৮৮৭ হিজরীতে গম্বুজ সংস্কার করেন। এরপর প্রায় ৩৬০ বছর পর উছমানী সুলতান আব্দুল হামীদ বর্তমান সবুজ গম্বুজ তৈরি করেন, এই হলো সবুজ গম্বুজের ইতিকথা।[৬] বিদআতী কবরপূজারীরা এই গম্বুজকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তাদের পীরবাবাদের কবরের উপর গম্বুজ তৈরি করছেন; যা খুবই হাস্যকর ও বিবেকহীন নোংরা কাজ। তারা একটু চিন্তাও করে না যে, কেমন করে এটা গ্রহণ করছি? অথচ তা রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর ৬০০ বছর পর তৈরি করা হয়েছে।

উছমানী সুলতান সেলিম আওয়াল ৯২৩ হিজরীতে মামলূকীদের থেকে মিশর জয়লাভ করলে পুরো হিজায তথা মক্কা-মদীনা অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। ফলে ৯২৩ হিজরী থেকে ১৩৪৪ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর মদীনা তাদের অধীনে ছিল। এসময় বিভিন্ন রকমের বিদআত চালু হয়। কবরের উপর গম্বুজ তৈরি হওয়াসহ শিরক-বিদআতে মদীনা ছেয়ে যায়।

সঊদ বংশের সন্তান আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ১৩৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৯২৪/২৫ খ্রিষ্টাব্দে মদীনা জয়লাভ করলে সেখানকার সকল প্রকার শিরক-বিদআত উৎখাত করেন। মদীনা নগরীকে তাওহীদী নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলেমদের দাওয়াতী কাজে নিয়োগ দেন। একই সঙ্গে মদীনা শহর ও মসজিদে নববী উন্নতকরণের সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাদশা আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর যোগ্য সন্তান বাদশা ফাহাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্তমান মসজিদ নববী তৈরি করেন। এরপর তার ভাই বাদশা আব্দুল্লাহ প্রায় দ্বিগুণ বেশি প্রশস্ত করে মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করছেন।[৭] তাদের খেদমত আল্লাহ কবুল করুন এবং এর উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মদীনার নাম :

ঐতিহাসিক সামহূদী মদীনার ৯৪টি নাম উল্লেখ করেছেন।[৮] এর মধ্যে ‘মদীনা’ নামটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআনে চার বার এসেছে *(আত-তওবা, ৯/১০১ ও ১২০; আল-আহযাব, ৩৩/৬০, আল-মুনাফিকূন, ৬৩/৮)*। মদীনার কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাম ‘তাবাহ’ ‘তাইবাহ’, যার অর্থ- উত্তম। জাহেলি যুগে মদীনার নাম ছিল ‘ইয়াছরিব’, কিন্তু নবী করীম ﷺ এই নাম অপছন্দ করতেন। তাই এর নাম রাখেন ‘আল-মাদীনা’।[৯] পবিত্র কুরআনে মদীনাকে ‘আদ-দার ওয়াল ঈমান’ বলা হয়েছে *(আল-হাশর, ৫৯/৯)*।

মদীনার সম্মান, মর্যাদা ও ফযীলত :

১. রাসূল ﷺ-এর প্রিয় নগরী : রাসূল ﷺ মদীনা নগরীকে ভালোবাসতেন এবং তা যেন অন্যদের প্রিয় হয় সেই দু‘আ করতেন। তিনি বলতেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও, যেমনিভাবে প্রিয় করেছো মক্কাকে, বরং তার চেয়েও বেশি প্রিয় করো’।[১০]

২. বরকতময় শহর ও মদীনা হারাম এলাকা : মদীনাকে শরীআতে ‘হারাম’ বলে ঘোষণা করেছে। হারাম শব্দের একটি অর্থ নিষিদ্ধ এবং আরেকটি পবিত্র। দুটি অর্থই এই নগরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল ﷺ বলেন, ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তা পবিত্র ও সম্মানিত হয়েছে। আর আমি মাদীনাকে

৫. ইমাম সামহূদী, ওফাউল ওফা বিআখবারে দারুল মুছত্বফা, ২/১১১-১২০।
৬. ফাছূলুত তারিখ মিন মদীনা আল-মুনাওয়ারা, পৃ. ২২৭-২৩০।
৭. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আব্দুল্লাহ ছালেহ, ‘তারিখে সঊদী আরব’।
৮. ইমাম সামহূদী, ওফাউল ওফা বিআখবারে দারুল মুছত্বফা, ১/১৩-৩০।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৮২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১০২২।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৮৯।

হারাম ঘোষণা করলাম; যা দুই পাহাড়ের (আইর ও উহুদ) মধ্যস্থলে অবস্থিত। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না, এখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং গাছপালার পাতাও পাড়া যাবে না। হে আল্লাহ! আমাদের এ শহরে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ছা'-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের মুদ-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দ্বিগুণ করুন। উল্লেখ্য, 'মদীনার 'আইর ও ছাওর' পর্বতের মাঝখানের স্থানটুকু হারাম'।[১১]

৩. নিরাপদ নগরী মদীনা, মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না : আল্লাহ তাআলা মদীনার প্রবেশদ্বারগুলোতে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, যারা এতে মহামারি ও দাজ্জালের প্রবেশ প্রতিহত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মদীনার পথে-প্রান্তরে রয়েছে (প্রহরী) ফেরেশতারা, (তাই) এখানে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না'।[১২]

৪. মদীনাবাসীদের ক্ষতিসাধনকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে : মদীনায় বসবাসের প্রতি রাসূল ﷺ উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'মদীনাই তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা জানত। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, মদীনার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে যে ব্যক্তিই এখান থেকে বের হয়ে যায়, আল্লাহ সেখানে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করে দেন। সাবধান! মদীনা (কামারের) হাপরের ন্যায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে বের করে দেবে। হাপর যেভাবে লোহার ময়লা বের করে দেয়, তেমনি মদীনাও তার মন্দ ব্যক্তিদের বের না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না'।[১৩] রাসূল ﷺ বলেন, لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ 'যে কেউ মদীনাবাসীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে'।[১৪]

৫. মদীনা ঈমানের স্থান : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا 'ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে, যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে'।[১৫]

৬. মদীনায় জ্ঞানচর্চা ও আলেমদের মর্যাদা : মদীনা ছিল প্রথম বিদ্যালয়, যেখানে মহানবী ﷺ এমন একটি প্রজন্মকে প্রস্তুত করেছিলেন, যাদের হাতে তিনি ইসলামের আমানত তুলে দেন। ইসলামী জ্ঞানের সূতিকাগার হিসেবে মদীনার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। রাসূল ﷺ বলেন, 'অচিরেই মানুষ উটে চড়ে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তারা মদীনার আলেমদের অপেক্ষা বিজ্ঞ আলেম আর কোথাও খুঁজে পাবে না'।[১৬]

মদীনায় আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় :

১. মদীনায় বিদআত ও যেকোনো পাপ পরিহার করতে হবে। নবী করীম ﷺ বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا 'যে ব্যক্তি মদীনায় কোনো বিদআত করে অথবা বিদআতীকে আশ্রয় দান করে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সব মানুষের লা'নত পড়বে। ক্বিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে আল্লাহ কোনো ইবাদত ও দান গ্রহণ করবেন না'।[১৭]

২. মদীনা মুনাওয়ারায় অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সঙ্গে বসবাস করতে হবে। বিশেষত মসজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআত সহকারে আদায় করতে হবে। কেননা অন্য মসজিদের চেয়ে এখানে ১ হাজারেরও বেশি গুণ ছওয়াব হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী তাসবীহ-তাহলীল, ইস্তিগফার, যিকির-আযকার ও জনকাল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

৩. মাঝে মাঝে মসজিদে কুবায় ছালাত পড়তে যেতে হবে। কারণ তাতে উমরার ছওয়াব হয়।

৪. বাক্বীউল গারকাদ কবরস্থান ও উহুদের শহীদ ছাহাবীগণের কবরস্থান যিয়ারত করতে হবে।

আল্লাহ আমাদের মদীনার ফযীলত হৃদয়ঙ্গম করে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৯, ১৩৭০, ১৩৭৪।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৮০।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৪১৮।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৩, ১৩৮৬।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৭৬।
১৬. সুনানে তিরমিযী, হা/২৬৮০; ইমাম নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, হা/৪২৭৭, ইমাম তিরমিযী হাদীছটি হাসান বলেছেন; ইমাম হাকেম হাদীছটি ছহীহ বলেছেন; ইমাম ইবনু হিব্বান ছহীহ বলেছেন।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৬।

'যে জ্ঞানার্জনের পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'

(ছহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূ দাঊদ হা/৩৬৪১)

উপেক্ষিত ধর্ম, নির্বাসিত মূল্যবোধ

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

১৭৯৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এ বিপ্লবের পেছনে দুটি সামাজিক উপাদান বড় প্রভাব ফেলেছিল। এর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি সমাজ ও রাষ্ট্র এ সময় নীতিহীনতায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। সামাজিক বৈষম্যের কারণে দেশে দারিদ্র্য বেড়ে গিয়েছিল। ফলে সমাজে অস্থিরতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। সমাজ থেকে মূল্যবোধ হারিয়ে গিয়েছিল। সময়ের ব্যবধানে সমাজের মুক্তিকামী জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। তারা নীতিহীনতার বিরুদ্ধে আপসহীন ভূমিকা প্রদর্শন করেছিলেন। মূল্যবোধ উপাদানটি এ সময় ফরাসি সমাজে আপসহীনতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ফলে ১৭৮৯ সালে সূচিত হওয়া বিপ্লব ১৭৯৯ সালে চূড়ান্তভাবে সংঘটিত হয়েছিল। একই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এ মূল্যবোধের যথেষ্ট চর্চা ছিল।

প্রাচীন ভারতে বহু ধর্মের লোক এক সমাজে পাশাপাশি বসবাস করত। তাদের মাঝে একে অপরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল। পাশাপাশি বসবাস করলেও কারো প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। এর মূল কারণ ছিল উন্নত মূল্যবোধ। প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় জীবন ছিল খুবই উন্নত। ধার্মিকরা ছিলেন চরম পরমতসহিষ্ণু ও পরধর্মসহিষ্ণু। ফলে তাদের সামাজিক মূল্যবোধ হয়ে উঠেছিল অনেক উন্নত। এ সময় বাংলায় মূল্যবোধের অনুশীলন ছিল চোখে পড়ার মতো। সুনীতি, সুশিক্ষা আর সুবিচার ছিল বাংলার শাসন ব্যবস্থার অনন্য শ্রেষ্ঠ উপাদান। সহনশীলতা, উদারতা, মায়া-মমতা আর মানবতা ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। ফলে পুরো উপমহাদেশ হয়ে উঠেছিল মূল্যবোধের পাঠশালা। কিন্তু বর্তমানের অবস্থাটা খুবই হতাশাজনক। বর্তমানে মূল্যবোধের চর্চা এখানে অনেকটাই উপেক্ষিত। বলা হয়ে থাকে, 'যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ'। বাংলার বর্তমান অবস্থাটা এ প্রবাদের প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভালোটা যেন সমাজ থেকে দিন দিন উঠে যেতে বসেছে। আগের সমাজের মানুষ ধনের চেয়ে নিজেদের সম্মানটাকে বড় করে দেখত। মান-সম্মানকে মানুষ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করত। কিন্তু বর্তমান সমাজটা একবারেই পালটে গেছে। সমাজের মানুষ বিরামহীন ছুটে চলছে বিত্তের পেছনে। বিরামহীন ছুটতে গিয়ে তারা জলাঞ্জলি দিচ্ছে তাদের সততা ও নৈতিকতা। জড়িয়ে পড়ছে তারা নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আর এটা এখন শুধু দেশের একটি সেক্টরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এ অনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন দেশের প্রতিটি সেক্টরে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের প্রভাবশালীদের অনেকে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে রয়েছেন। 'ভবিষ্যতে অনেককেই জেলে যেতে হবে' ভয়ে বাঁচবার জন্য তারা এখন থেকেই অনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেশের বর্তমান সমাজ ও অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই নীতিহীনতায় নিমজ্জিত। সমাজে এ নীতিহীনতাই মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে পরিচিত। দেশে নীতির চর্চা এখন অনেকটা বোকাদের কাজে রূপান্তর লাভ করেছে। নীতিবান লোককে এখন সমাজে তেমন আর সম্মান করা হয় না। সম্মান এখন টাকা ও অর্থ দ্বারা বিবেচনা করা হয়। অথচ এ দেশেই এককালে নীতিবান হতদরিদ্র ব্যক্তিকেও সম্মানের চোখে দেখা হতো। প্রাচীন বাংলায় এসব নীতিবান ব্যক্তিই গুণীজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ সমস্ত গুণীজনকে সমাজের সকলেই সম্মানের চোখে দেখত। কিন্তু বর্তমানে বাংলায় সেদিন আর অবশিষ্ট নেই। নীতি আর মূল্যবোধ চর্চাকে এখন বিদ্রুপের চোখে দেখা হয়। সমাজ এখন 'টাকা যার, সম্মান তার' নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। নীতিবান গুণীজনেরা সমাজে অনেকটা অপাঙক্তেয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। বাংলার সমাজ এখন আর নীতিবান গুণীজনদের কদর করে না। তারা কদর করে সূদখোর টাকাওয়ালা মহাজনদের। এসব টাকাওয়ালা ব্যক্তিবর্গ এখন সমাজের পরিচালক ও নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে তারা প্রচণ্ড প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী আর দেশের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছেন। তাদেরকেই সমাজের লোকজন এখন তৈল মারায় ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ। সমাজ এখন এসব প্রভাবশালীকেই সম্মান-তাযীম ও সংবর্ধনা প্রদান করে। সংবর্ধনা সভায় এ নীতিহীন মানুষগুলোর মুখ থেকেই আবার নীতিবাক্য উচ্চারিত হয়!

মুখের উচ্চারণ আর কাগজের মাঝেই দেশের মূল্যবোধ এখন আটকে রয়েছে। প্রভাবশালীদের অনৈতিক শক্তিতে শিকলবন্দি হয়ে পড়েছে দেশের মূল্যবোধ। বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী প্রজন্ম মনুষ্যত্বকে হারিয়ে একেবারে পশুতে পরিণত হতে পারে। নিকট ভবিষ্যতে নতুন প্রজন্ম মূল্যবোধকে রূপকথার কল্পকাহিনি হিসেবে খুঁজে ফিরবে। আধুনিক যুগে বাংলাদেশের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত দুর্বল এবং প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূল্যবোধকে পুঁজি করে। একই বছরের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছিল। এ ঘোষণাপত্রটি ছিল মূল্যবোধে উজ্জীবিত এক অসামান্য মূলনীতি। মূল্যবোধের দিক থেকে এ ঘোষণাপত্রটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে অনন্য এক দলীল। এটি ছিল

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

বাংলাদেশের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান। ছিল রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার আইনি দলীল। এ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে— ‘বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করনার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।’ মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধে রচিত এ সংবিধান আজ বলতে গেলে দেশের সবক্ষেত্রে উপেক্ষিত। স্বাধীন দেশের মানুষের জন্য এটা একদিকে যেমন দুঃখজনক, তেমনি লজ্জাজনকও বটে। কারণ জারিকৃত উক্ত নীতির ভিত্তিতে আজকের বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে না।[১] মূলত জারিকৃত উল্লেখিত মূল্যবোধের অনুপস্থিতিটাই হলো আমাদের সামাজিক অবক্ষয়। সমাজে যখন নৈতিক স্খলন ঘটে, যখন চ্যুতি-বিচ্যুতি ঘটে, তখনই তাকে সামাজিক অবক্ষয় বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ আজ নানামুখী অবক্ষয়ে জর্জরিত। বাংলাদেশের সমাজে মাদক এবং ইয়াবার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। গাঁজা, ফেনসিডিলের ব্যবসাও রমরমা। মাদকতার স্রোতে দেশের যুবসমাজ আজ ভেসে যেতে বসেছে। দেশের কোনো কোনো জনপ্রতিনিধি এ ব্যবসার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি দেশের জনপ্রিয় কয়েকজন নায়ক-নায়িকা মদের ব্যবসার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। এছাড়া দেশের নামিদামি অনেকেই এ ব্যবসায় জড়িত বলে মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে।

লোকাল এডুকেশন এন্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্টের মতে, বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লাখ শিশু আছে, যাদেরকে পথশিশু বলা হয়। এদের মধ্যে ১৯ শতাংশ শিশু হিরোইন আসক্ত। ৪০ শতাংশ ধূমপায়ী। ২৮ শতাংশ শিশু ট্যাবলেটে আসক্ত। আর ৮ শতাংশ শিশু আছে যারা ইনজেকশনে আসক্ত। এটা জাতি-রাষ্ট্রের জন্য ভয়ানক এক অশুভ ইঙ্গিত। এটা মানবিক মূল্যবোধের চরমতম অবক্ষয়। দেশে বন্যার পানির মতো পর্নোগ্রাফির আসক্তি বেড়ে গেছে। তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীরা বর্তমানে পর্নোগ্রাফির ভয়াল নেশায় মত্ত। আর শুধু শিক্ষার্থীদের মাঝেই এ নেশা সীমিত নয়। মধ্যবয়সি নারী-পুরুষও এ মরণ নেশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এক তথ্য মতে, রাজধানী ঢাকার স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০ ভাগ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। ফলে পর্নোগ্রাফি আসক্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ফলশ্রুতিতে অপরিণত ও অসংগতিপূর্ণ যৌনাচার সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। আর এসব অবক্ষয়ের সাথে জড়িত অধিকাংশই শিক্ষিত জনশক্তির অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত অবক্ষয়সৃষ্ট অস্থিরতার কারণে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা। এ অবক্ষয়ের ব্যাপ্তি সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করেছে। ফলে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিয়েছে। তারা ধৈর্য, উদারতা ও শিষ্টাচার হারিয়ে ফেলেছে। কর্মে তাদের নান্দনিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সৃজনশীলতা লোপ পেয়েছে। তারা তাদের অধ্যাবসায়, দেশপ্রেম, কল্যাণবোধ ও দায়িত্ববোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলি নষ্ট করে ফেলেছে। সামগ্রিক জটিলতার কারণে মানবিক মূল্যবোধের জায়গায় স্থান পেয়েছে সামাজিক অবক্ষয়। দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবক্ষয় এখন জয়-জয়কার অবস্থা।

দেশের ব্যাংক ব্যবসায় দুর্নীতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। বেসিক ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে রিজার্ভ চুরি দেশের মূল্যবোধের বড় অবক্ষয়ের নির্দেশক। শেয়ারমার্কেট, ডেসটিনি, যুবক আর হলমার্ক কেলেঙ্কারির ঘটনা নৈতিক মূল্যবোধ বিচ্যুতির নির্দেশ প্রদান করে। দেশে নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও চুরির ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাকাতি, ছিনতাই, গুম ও খুন এখন স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাস, রাহাজানি ও নৈরাজ্য সামাজিক অবক্ষয় বিস্তৃতির এক মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ। এসব অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, সর্বগ্রাসী অশ্লীলতা ও মাদকতা। পাশাপাশি রয়েছে ধর্মবিমুখতা, ধর্মের অপব্যবহার ও ধর্মব্যবসা। অথচ যুগযুগ ধরে ধর্মই মানুষকে ভদ্র করে গড়ে তুলেছে। ধর্মের সঠিক অনুশীলন ও শিক্ষা মানুষকে রুচিশীল ও সাংস্কৃতিবান করেছে। ধর্ম ধার্মিকদেরকে করেছে ভদ্র ও মার্জিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের সময়কালে আরবের প্রায় সকল মানুষ ছিল ইতর, বর্বর আর নিকৃষ্ট। ছিল তারা অভদ্র, নির্দয়, নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী-পাপী। অথচ ধর্মের সঠিক শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সেই তারাই বিশ্বসেরা ভালো মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। ধর্মের যথাযথ অনুশীলন তাদেরকে তৎকালীন বিশ্বসেরা গুণীজন হিসেবে ভূষিত করেছিল। গুণীজন হিসেবে তারা শুধু পৃথিবীতেই সেরা মানুষ ছিলেন না; বরং পরকালের জন্য নির্বাচিত সেরা মানুষের স্বীকৃতিটাও এ পৃথিবী থেকে পেয়ে গিয়েছিলেন। ‘আল্লাহ তাদের (ছাহাবীদের) উপর খুশী আর তারাও আল্লাহর প্রতি খুশী’ *(আল-বাইয়্যেনাহ, ৯৮/৮)*। হাদীছে এসেছে, ‘আবূ বকর, উমার, আলী, উছমান, তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনু জায়েদ ও আবূ ওবায়দা ইবনু যাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম এ ১০ জন ছাহাবী দুনিয়া থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেছেন’।[২] এরকম মূল্যবোধে সিক্ত মানুষ আর পৃথিবীতে আসবে না। বিশ্বের সকল ইতিহাস এটাই জানান দেয় যে, পৃথিবীর সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোনো না কোনো ধর্মকে কেন্দ্র করে। তাই মূল্যবোধে সিক্ত একটি সমাজ গড়তে প্রয়োজন ধর্মের ব্যাপক শিক্ষা ও তার যথার্থ অনুশীলন। প্রয়োজন ধর্ম লালন ও তার সম্প্রসারণ। ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ তাই বলেছেন, ‘যে সমাজে মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রাধান্য থাকে, তাকে সভ্য সমাজ বলে’।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

১. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ এপ্রিল, ২০১৬।

২. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৯৯৬।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (৯ম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ১৬তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে : *ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র; তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন লায়ছ; তিনি হাদীস বর্ণনা করেন উকায়ল থেকে; তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবায়ের থেকে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অহির সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন সেটিই সকালের মতো তার সামনে সত্যরূপে উদ্ভাসিত হতো। অতঃপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে তিনি হেরা গুহায় নির্জনে সময় কাটান এবং সেখানে বেশ কয়েক রাত্রি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন- প্রয়োজনীয় পাথেয় নেওয়ার জন্য পরিবারের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত। তারপর তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট ফিরে আসতেন, এবং অনুরূপভাবে পাথেয় নিয়ে যেতেন। এভাবেই একদিন তিনি হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাসত্য (অহী) চলে আসে। ফেরেশতা তাঁর নিকটে এসে তাঁকে বলেন, পড়ুন! তিনি বলেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ফেরেশতা আমাকে ধরলেন এবং এমনভাবে জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। ফলে ফেরেশতা আমাকে দ্বিতীয়বার ধরলেন এবং এমনভাবে জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি আমাকে তৃতীয়বার ধরে এমনভাবে জোরে চাপ দিলেন যে আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্ত হতে। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত'।*

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়াতগুলো নিয়ে ফিরে আসেন এসময় তাঁর বুক ধড়ফড় করছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! অতঃপর তারা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে পুরো ঘটনা জানালেন এবং বললেন, আমি আমার জীবনের ভয় পাচ্ছি। তখন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, কখনোই নয়! আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অপারগ ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন, দুর্যোগগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করেন। অতঃপর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে সাথে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাক্বা ইবনু নওফেলের কাছে নিয়ে যান, যিনি জাহেলী যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিব্রু ভাষায় বই লিখতেন। আল্লাহ যতটুকু চেয়েছিলেন, তিনি হিব্রু ভাষায় ইঞ্জীল লিখেছিলেন। তিনি একজন বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কাছে শুনুন (তাঁর বৃত্তান্ত)! তখন ওয়ারাক্বা তাঁকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ভাতিজা, আপনি কী দেখেছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা দেখেছিলেন তাঁকে তা জানালেন। অতঃপর ওয়ারাক্বা তাঁকে বললেন, ইনিই সেই 'নামূস' (গোপন বার্তাবাহক অর্থাৎ জিবরীল) যাকে মহান আল্লাহ মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! যদি আমি সে সময় যুবক থাকতাম এবং যদি আমি সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম যেদিন আপনার জাতি আপনাকে বের করে দিবে! তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইতোপূর্বে যে ব্যক্তিই এই বার্তা নিয়ে এসেছে, যে বার্তা নিয়ে আপনি এসেছেন, তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আপনার সে সময় পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি আপনাকে মযবূতভাবে সহযোগিতা করব। কিন্তু কিছুদিন পর ওয়ারাক্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করেন। আর অহি কিছু দিনের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।]

প্রথম অবতীর্ণ পাঁচটি আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত পাঁচ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয় এই পাঁচটি আয়াত পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য সম্বলিত। এগুলোর মাধ্যমে অহি বা কুরআনের সূচনার শ্রেষ্ঠত্ব বস্তুত এখানেই নিহিত রয়েছে। এই পাঁচ আয়াতকে যদি কুরআনের হেডলাইন বলা হয় তবুও ভুল হবে না। এই জন্য যে, বইয়ের শিরোনাম বইয়ের পরিচিতি বহন করে। এই পাঁচটি আয়াতে উছূলুদ দ্বীন, আল্লাহর তাওহীদ ইত্যাদি বিষয়ের দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়।[১]

পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানের গুরুত্ব, আল্লাহর নামের মাধ্যমে শুরু করার আদেশ দিয়ে তার নামের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বুঝানো হয়েছে। ছোট থেকে ছোট ও বড় থেকে বড় কাজ মহান আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তাঁর নামেই শুরু করা উচিত। 'যিনি সৃষ্টি করেছেন' বলার মাধ্যমে আল্লাহর রুবূবিয়্যাত তথা তাঁর তাওহীদ ও একত্বের দিকে ইশারা। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। 'রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন' বলার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। রক্তপিণ্ড তো আর এমনিতেই তৈরি হতে পারে না। শুক্র থেকে কয়েক ধাপ অতিক্রম করে রক্তপিণ্ড হতে হয় আবার রক্তপিণ্ড থেকে পূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য কয়েক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। মহান আল্লাহর নিপুণ সৃষ্টির ব্যতিক্রম

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ফাতহুল বারী, ৮/৭১৮।

নিদর্শন হচ্ছে মানুষ স্বয়ং নিজেই। 'তোমার প্রতিপালক সম্মানিত' বলার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ এমন মহানুভব সম্মানিত আকরাম বা কারীম যে, তিনি কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই মানুষের উপর ইহসান করেন। তাঁর অন্যতম ইহসান হচ্ছে জ্ঞান। পরের আয়াতে সেই জ্ঞানের দিকে ইশারা করে তিনি বলেন, 'আর মানুষকে মহান আল্লাহ সেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না'। এই আয়াত প্রমাণ করে তিনি সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষ মূলত সর্বৈব অজ্ঞ। মহান আল্লাহ যতটুকু জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন মানুষ ততটুকুই জানে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষের পর কত লাখো-কোটি জিনিস আছে মানুষের অজানা। যা জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে জানতে পারছে। যেমন আজকের আধুনিক যুগের আগে মানুষ এই বিষয়গুলো জানত না ঠিক তেমনি অগণিত বিষয় আছে যা মানুষ এখন জানে না। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যদি মানুষের জ্ঞান-গবেষণা চলতে থাকে তবুও মানুষ মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্যই জানতে পারবে। মানুষের এই জানার তুলনা মহাসাগরের বুকে এক বিন্দু পানির মতো। শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহর অজ্ঞ সৃষ্টিজীবকে তাঁরই জ্ঞানের মহাসমুদ্র থেকে বিন্দু পরিমাণ জ্ঞান শিখানোর মধ্যে যেমন মহান আল্লাহর অসীম সত্তার সীমাহীন বড়ত্ব রয়েছে, তেমনি মানুষের নত হয়ে, নিরহংকারী হয়ে তাঁরই সিজদায় অবনত হওয়ার শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

হাদীছের শিক্ষা বা উপকারিতা :

(১) রাসূল ﷺ-এর নিকটে অহির শুরু হয়েছে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। সত্য স্বপ্ন অহির অংশ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ 'সত্য স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। অনেক মুহাদ্দিছ এই হাদীছের গাণিতিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাসূল ﷺ-এর নিকট সত্য স্বপ্ন অহির শুরুর দিকে ছয় মাস যাবৎ এসেছে। তার পরবর্তী ২৩ বছর নবুঅত জীবনকে মাসের হিসেবে নিয়ে গেলে তিনি ২৭৬ মাস সরাসরি নবুঅতী অহি পেয়েছেন। আর ২৭৬ মাসকে ছয় মাস দিয়ে ভাগ দিলে ৪৬ হয়। তথা তার সত্য স্বপ্নময় প্রথম ছয় মাস তার নবুঅতী জীবনের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। আল্লাহর রাসূলের জীবনের হিসাবগতভাবেও সত্য স্বপ্ন অহির ৪৬ ভাগের এক ভাগ। যদিও আমি মনে করি, এই ধরনের হিসাবের কোনো প্রয়োজন নাই। কেননা আরো বিভিন্ন বর্ণনায় সত্য স্বপ্নকে নবুঅতের ভাগ বলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কিছু বর্ণনায় ৭০ ভাগের এক ভাগও বলা হয়েছে।[২] ওয়াল্লাহু আ'লাম বিস সওয়াব।

২. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ইউসুফ, ১২/৫।

(২) রাসূল ﷺ-এর হেরা গুহায় যাওয়ার সময় কয়েক দিনের খাদ্য সাথে নেওয়া প্রমাণ করে সফরের জন্য পাথেয় গ্রহণ করা আল্লাহ ভরসার পরিপন্থী নয়। বরং মানুষ যে রিযিক্বের মুখাপেক্ষী তার প্রমাণ বহন করে।

(৩) রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের নিকট প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে, ইসলামে সন্ন্যাসবাদ সমর্থন করে না। স্বাভাবিক জীবনযাপনের পাশাপাশি মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর সাধ্য অনুযায়ী ইবাদত করাই ইসলাম।

(৪) একজনের আনীত সংবাদ গ্রহণযোগ্য। সংবাদের সত্যতার মাপকাঠি সংখ্যার উপর নয়; ব্যক্তির সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর। যেমনটা জিবরীলকে রাসূল ﷺ বিশ্বাস করেছেন। রাসূল ﷺ-কে খাদীজা ও ওয়ারাকা বিশ্বাস করেছেন এবং সত্যায়ন করেছেন।

(৫) মানবসেবা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার মাধ্যম, বিপদ থেকে উদ্ধারের মাধ্যম।

(৬) একাকিত্ব শরীর ও মনের জন্য অনেক উপকারী। জ্ঞান-গবেষণার নিয়ামক। উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক।

(৭) খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর মতো বিপদে সাহস প্রদানকারী স্ত্রীরাই আদর্শ স্ত্রী।

(৮) যারা দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করেন, তাঁরা বহুলাংশে স্বজাতি কর্তৃক যুলমের স্বীকার হন।

(৯) মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনবার্তা পূর্বের কিতাবগুলোতে বর্ণিত ছিল।

অন্য সনদে বর্ণিত অতিরিক্ত অংশ :

উক্ত হাদীছের শেষে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ ভিন্ন সনদে অন্য একটি হাদীছের খণ্ডিত অংশ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে উক্ত খণ্ডিত অংশের অনুবাদসহ ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ} إِلَى قَوْلِهِ {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}[المدثر : 1-5] فَحَمِيَ الوَحْيُ وَتَتَابَعَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ..

ইবনু শিহাব যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ﷺ-এর সাময়িকভাবে অহি স্থগিত হওয়ার হাদীছ বর্ণনা করছিলেন, সেই হাদীছে রাসূল ﷺ বলেছেন, একদা আমি হাঁটছিলাম, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি উপরে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন; তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে

বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। তারপর আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, ‘হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! উঠুন, (মানুষকে) সতর্ক করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা (অর্থাৎ মূর্তি-প্রতিমা) পরিত্যাগ করুন’ *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/১-৪)*। এরপর নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে অহি নাযিল হতে থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও আবূ ছালেহ রাহিমাহুল্লাহ অনুরূপ (অর্থাৎ فؤاده শব্দ) বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবনু রাদদাদ রাহিমাহুল্লাহ যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম যুহরী থেকে ইউনুস ও মা‘মার রাহিমাহুমাল্লাহ فؤاده এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

রাবী পরিচিতি :

আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান :

নাম : আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আওফ। তিনি মহান ছাহাবী জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আব্দুর রহমান ইবনু আওফের সন্তান। তাঁর নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁর নামের বিষয়ে যে মতগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ও ইসমাঈল। আবার কেউ বলেছেন, তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) তথা আবূ সালামাই তাঁর নাম।

বংশ : কুরাশী, মাদানী, যুহরী।

মর্যাদা : তিনি মদীনার সাত জন বিখ্যাত ফক্বীহের একজন। দুধমায়ের দিকদিয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তাঁর খালা ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন মদীনার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরাইশ বংশ থেকে যারা বড় ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) উসামা ইবনু যায়েদ (২) আনাস ইবনু মালেক (৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (৪) হাসসান ইবনু ছাবেত (৪) যায়েদ ইবনু ছাবেত (৫) তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ (৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৭) উবাদা ইবনু ছমেত (৮) আব্দুর রহমান ইবনু আওফ।

ছাত্রবৃন্দ : (১) জা‘ফর ইবনু রাবীআ (২) উরওয়া ইবনুল যুবায়ের (৩) আমর ইবনু দীনার (৪) উমার ইবনু আব্দুল আযীয (৫) মূসা ইবনু উক্বরা (৬) হিশাম ইবনু উরওয়া (৭) ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর।

মৃত্যু : মদীনায় ৯৪ মতান্তরে ১০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনছারী :

নাম : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হারাম আল-আনছারী।

কুনিয়াত : আবূ আব্দুল্লাহ। তাঁকে আবূ আব্দুর রহমানও বলা হয়ে থাকে।

বংশ : খাযরাজী, আনছারী, সুলামী, মাদানী।

সম্মান : তাঁর বাবা আব্দুল্লাহ উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। তিনি তাঁর বাবার রেখে যাওয়া কর্য পরিশোধ ও নয় জন বোনের লালনপালন নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। এই ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সেই সমস্ত ছাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা প্রচুর পরিমাণে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বাবার জীবদ্দশায় বোনদের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়ে তিনি খালেদ ইবনু ওয়ালিদের সেনাপতিত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর করা প্রশ্নের ভিত্তিতেই কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয় *(আন-নিসা, ৪/১৭৬)*। সিফফীনের যুদ্ধের পর তিনি নিজেকে হাদীছশাস্ত্রের জন্য নিবেদিত করেন। শুধু একটি হাদীছ শ্রবণ করার জন্য তিনি মিশর সফর করেন। মসজিদে নববীতে হাদীছের দারসের জন্য তাঁর স্থায়ী হালাকা ছিল।

শিক্ষকবৃন্দ : (১) আলী ইবনু আবী তালেব (২) উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (৩) মুআয ইবনু জাবাল (৪) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (৫) তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ (৬) আবূ সাঈদ খুদরী (৭) আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (৮) আবূ হুরায়রা প্রমুখ ছাহাবীবৃন্দ।

ছাত্রবৃন্দ : (১) আল-হাসান আল-বাছরী (২) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (৩) সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (৪) সুলায়মান ইবনু আতীক্ব (৫) উরওয়া ইবনুল জুবায়ের (৬) আতা ইবনু ইয়াসার (৭) আতা ইবনু আবী রাবাহ (৮) আমর ইবনু দীনার।

মৃত্যু : মদীনায় ৭০ হিজরীর পরে মৃত্যুবরণ করেন।

সনদের সূক্ষ্মতা :

وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ.

উক্ত বাক্যে ইউহাদ্দিছু এর ফায়েল নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, এখানে ঘটনা বর্ণনাকারী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ। আর কারো মতে, এখানে ঘটনা বর্ণনাকারী স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। দ্বিতীয় মতটিই বেশি বিশুদ্ধ কেননা মুসলিমের বর্ণনায় সেটি স্পষ্ট হয়েছে।

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ.

আল্লাহর রাসূলের ছাহাবী জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু একদিন হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অহি স্থগিত হওয়ার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন।

সুতরাং প্রমাণিত হলো উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যা ছহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় আরো স্পষ্টভাবে আছে।

ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي.

তথা স্বয়ং রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তারপর আমার উপর অহি আসা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর একদিন আমি হাঁটছিলাম।[৩]

অপরিচিত শব্দ :

فَحَمِيَ الْوَحْيُ ‘অতঃপর অহি গরম হয়ে যায়’। আমরা বর্তমানে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে কোনো একটা ইস্যু নিয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হলে বলে থাকি, উমুক বিষয়টি নিয়ে ফেসবুক খুব গরম হয়ে আছে। আবার যখন আলোচনা-সমালোচনা কমে যায় তখন বলি, বিষয়টি নিয়ে এখন সবাই ঠান্ডা; কেউ কিছু বলছে না। ঠিক আমরা যেমন গরম ও ঠান্ডা শব্দটি কোনো কিছুর চালু থাকা ও থেমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি তেমনি আরবীতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে অহি গরম হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অহি চলতে থাকে।

উক্ত অংশটি তাহবীল না তা‘লীক্ব?

আমরা বাংলা অনুবাদে দেখেছি আলোচিত হাদীছটি ইবনু শিহাব যুহরী দিয়ে শুরু হয়েছে। ইমাম বুখারী থেকে ইবনু শিহাব যুহরী পর্যন্ত কোনো সনদ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং সনদবিহীন ইবনু শিহাব যুহরীর উক্ত বর্ণনা কি তা‘লীক্ব বা বিচ্ছিন্ন সানাদ সংবলিত হাদীসের মধ্যে গণ্য হবে? উল্লেখ্য যে, আমরা মিন্নাতুল বারীর ভূমিকায় ছহীহ বুখারীর তা‘লীক্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আজকের আলোচনায় প্রথমত আমরা দেখে নেই তাহবীলের পরিচয়।

তাহবীলের সংজ্ঞা : হাদীছ বর্ণনার মধ্যে এক সনদ থেকে অন্য সনদে যাওয়াকে তাহবীল বলা হয়। বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থে তাহবীলের চিহ্ন হিসেবে আরবী (ح) হা বর্ণটি ব্যবহার করা হয়। যেমন—

সনদ নং ১ : ইমাম বুখারী ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়ের থেকে তিনি লায়ছ ইবনু সা‘দ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন।

সনদ নং ২ : ইমাম বুখারী হাদীছটি আরো শুনেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ থেকে, তিনি ইমাম মালেক থেকে।

উভয় সনদের ইমাম মালেক ও লায়ছ ইবনু সা‘দ হাদীছটি শুনেছেন হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে। এই উদাহরণে আমরা দেখেছি ইমাম বুখারী লায়ছ ইবনু সা‘দ পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করার পর আবার আরেকটি নতুন সনদ তার সাথে যুক্ত করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফের নাম নিয়ে প্রথম থেকে শুরু করেছেন। এভাবে নতুন একটি সনদের জন্য মধ্যখান থেকে পুনরায় শুরুতে ফিরে আসাকেই তাহবীল বলা হয়।

তাহবীল মূলত দুই প্রকার হয়ে থাকে—

(ক) সনদের প্রথমে তাহবীল : তথা হাদীছের সংকলক মুহাদ্দিছ হাদীছটি প্রথম থেকেই আলাদা আলাদা কয়েকটি সনদে বর্ণনা করেন যে, আলাদা আলাদা সনদগুলো নির্দিষ্ট একজন শায়খ যাকে (مدار) মাদার বা আবর্তনস্থল বলা হয়, সেখানে এসে একত্রিত হয় এবং সনদগুলোর মিলনস্থল থেকে ছাহাবী পর্যন্ত পরবর্তী সনদ একটিই হয়।

(খ) সনদের মধ্যে তাহবীল : সংকলকের নিকট থেকে নির্দিষ্ট একজন শায়খ বা (مدار) মাদার বা আবর্তনস্থল পর্যন্ত সনদ একটাই কিন্তু আবর্তনস্থল থেকে ছাহাবী পর্যন্ত সনদ আলাদা। তখন সনদের মধ্যখানে সংকলককে তাহবীল করতে হয়।

অন্যদিকে তা‘লীক্বে আগের কোনো সনদের পরিবর্তন থাকে না, বরং সম্পূর্ণ আলাদা হাদীছ সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করাকে তা‘লীক্ব বলা হয়।

যাহোক, আমাদের আলোচ্য বর্ণনাটি আল্লামা কিরমানীর মতে, তা‘লীক্ব বা বিচ্ছিন্ন সানাদ সংবলিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত।[৪] কিন্তু হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, উক্ত বর্ণনা তাহবীলের অন্তর্ভুক্ত।[৫] তথা আমাদের আলোচিত হাদীছের মূল সনদ পূর্বের হাদীছের সনদ। সনদের আবর্তনস্থল যুহরী থেকে এক সনদে পূর্বের হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আর আরেক সনদে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলো—

ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়ের-লায়ছ-উক্বায়েল-যুহরী।

উভয় হাদীছের মূল সনদ এটিই। সনদের মিলনস্থল যুহরী। যুহরী থেকে দুটি আলাদা সনদ রয়েছে। প্রথম সনদটি হচ্ছে যুহরী-উরওয়া-আয়েশা। আর এই সনদেই পূর্বের লম্বা হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী সনদটি হচ্ছে যুহরী-আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান-জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ। এই সনদে আমাদের আলোচ্য হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

তাহবীল হওয়ার দলীল :

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

এখানে ‘ইবনু শিহাব যুহরী বলেছেন’ বলার পর ‘ওয়া আখবারানী’ যুক্ত করা হয়েছে। ‘ওয়া আখবারানী’ এর ওয়াও আতেফা প্রমাণ করে এটি পূর্বের কোনো সনদের সাথে যুক্ত।

সুতরাং উক্ত হাদীছটি মুআল্লাক্ব নয় এবং ইমাম বুখারী ইমাম যুহরী পর্যন্ত সনদ বিলুপ্তও করেননি। বরং পূর্বের হাদীছের সনদেই ইমাম যুহরী পর্যন্ত যাওয়ার পর সেখান থেকে অন্য সনদে অতিরিক্ত কিছু তথ্য যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এটি আলাদা হাদীছ নয়, বরং পূর্বের হাদীছের অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত কিছু অতিরিক্ত বাক্য। পূর্বের হাদীছ শেষ করা হয়েছে অহি স্থগিত হওয়া কথার মাধ্যমে। আর একই হাদীছের ভিন্ন সনদে এখানে অহি স্থগিত হওয়ার পর পুনরায় অহি কখন চালু হলো তার আলোচনা করা হয়েছে।

(চলবে)

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬২১৪।

৪. কিরমানী, আল-কাওয়াকিবুদ দুরারী, ১/৪১।

৫. ফাতহুল বারী, ১/২৮।

দাজ্জাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী*

(পর্ব-৩)

হাদীছ-১৩ : ‘আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে’।[১]

পর্যালোচনা : তিনি দলীল হিসেবে ‘শারহুস সুন্নাহ’-এর উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। হাদীছটি হলো—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ.

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মধ্য হতে ৭০ হাজার লোক দাজ্জালকে অনুসরণ করবে’।[২]

তাহক্বীক্ব : এটি নিতান্তই যঈফ হাদীছ। (ক) শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন।[৩] তিনি বলেছেন, ضعيف جداً بلفظ أمتي ‘আমার উম্মত’ শব্দ যোগে এটি অত্যন্ত দুর্বল। আমি বলেছি, সনদটি খুবই যঈফ। আবূ হারূনের নাম হলো উমারাহ ইবনু জুয়াইন। হাফেয (ইবনু হাজার) আত-তাকরীব গ্রন্থে বলেছেন, তিনি মাতরূক। তিনি তাদের মধ্য হতে রয়েছেন, যাদেরকে মিথ্যুক বলা হয়েছে।[৪] অতঃপর তিনি বলেছেন, লোকেরা বলেন যে, ‘আমার উম্মত’ দ্বারা ‘উম্মতে দাওয়াহ’ হওয়ার সম্ভাবনা আছে— (যদি তাই হয়ে থাকে) তবে এক্ষেত্রে কোন বৈপরীত্য নেই। **আমি বলেছি :** হ্যাঁ, এটি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এটি তাবীল। তাবীল ‘তাছহীহ’-এর শাখা। যতক্ষণ হাদীছটি ছহীহ হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাবীলের প্রতি কোনো আহ্বায়ক থাকবে না।[৫] (খ) শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘এর সনদ খুবই দুর্বল। বাগাবী রাহিমাহুল্লাহ এটি শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৬] এতে আবূ হারূন আল-আবদী নামী মাতরূক (পরিত্যক্ত, যাকে বাতিল করা হয়েছে) রাবী রয়েছেন। যিনি মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত। আর ছহীহ মুসলিমের হাদীছটি (হা/২৯৪৪) এর বিরোধী’।[৭] (গ) মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, قِيلَ فِي سَنَدِهِ أَبُو هَارُونَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ‘বলা হয়েছে, এর সনদে আবূ হারূন রয়েছেন। আর তিনি মাতরূক’।[৮]

এটি ছহীহ মুসলিমের হাদীছেরও সরাসরি বিরোধী। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ‘ইস্পাহানের ৭০ হাজার ইয়াহূদী দাজ্জালের অনুগত হবে। যাদের পরনে ত্বায়ালিসা (এক ধরনের সেলাইবিহীন লম্বা চাদরজাতীয় পোশাক) থাকবে’।[৯]

অতএব, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্য হতে ৭০ হাজার লোক তাকে অনুসরণ করবে বলে দাবি করা বাতিল।

উল্লেখ্য, উম্মত দুই প্রকার— **(১) উম্মতে ইজাবাহ :** যারা নবীর দাওয়াতকে কবুল করেছেন। **(২) উম্মতে দাওয়াহ :** যারা নবীর দাওয়াতকে কবুল করেননি। তবে দাওয়াত পেয়েছেন। দাজ্জাল নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত বলতে ‘উম্মতে দাওয়াহ’-এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছ-১৪ : ‘দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন কোরবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মত তার করায়ত্ত হবে’।[১০]

পর্যালোচনা : এমন কোনো হাদীছ নেই। এর কাছাকাছি একটি হাদীছ রয়েছে। তা হলো, وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ। ‘অচিরেই দাজ্জাল হারাম এবং বায়তুল মাক্বদেস ব্যতীত সমগ্র যমীনকে জয় করবে’।[১১] যা হাদীছে নেই তা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হারাম।

হাদীছ-১৫ : ‘আরবে এমন কোন স্থান থাকবে না যা দাজ্জালের পদতলে না আসবে না সেখানে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি না থাকবে’।[১২]

পর্যালোচনা : তিনি ছহীহ বুখারী এবং মুসলিমের উদ্ধৃতি প্রদান করলেও এই গ্রন্থদ্বয়ে এমন কোনো হাদীছ আমরা পাইনি। বরং এটা ঐ হাদীছের বিরোধী, যেখানে বলা হয়েছে

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৪৬।
২. তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৫৪৯০।
৩. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, হা/৪২৬৫; মিশকাত, হা/৫৪৯০।
৪. সিলসিলা যঈফা, হা/৬০৮৮।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. শারহুস সুন্নাহ, হা/৪২৬৫, ১৫/১২।
৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৫৪৯০, ৩/২৭৭।
৮. মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/৩৪৮১।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪৪।
১০. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৪৮।
১১. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, হা/১২৩০।
১২. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৪৯।

যে, ‘দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না’।[১৩]

হাদীছ-১৬ : ‘দাজ্জাল পৃথিবীর সর্বত্র যেতে পারবে ও যাবে কিন্তু মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। মদীনায় প্রবেশের প্রত্যেক দরজায় দু’জন করে মালায়েক (ফেরেশতা) পাহারা দিবে যারা দাজ্জালকে সেখানে প্রবশ করতে দিবে না’।[১৪]

পর্যালোচনা : তিনি আবূ বাকরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর বর্ণিত ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। ছহীহ বুখারীতে আবূ বাকরাহ বর্ণিত হাদীছটি ‘ফিতান’ অধ্যায়-এর মধ্যে দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা অনুচ্ছেদে আছে।[১৫] কিন্তু এ হাদীছে মক্কার কথা নেই। কেবল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না বলে বলা হয়েছে। ফাতেমা বিনতে ক্বায়স রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর বর্ণিত হাদীছটিতে মক্কা ও মদীনার কথা আছে।[১৬]

হাদীছ-১৭ : ‘আল্লাহর রাসূল দাজ্জালকে কখনো কখনো মাসীহ উল-কাযযাব বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন (আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে মোসলেম)। আবার কখনো কখনো তাকে মাসীহ উদ্-দাজ্জাল বোলেও বর্ণনা করেছেন (আবু হোরায়রা (রা) থেকে বোখারী ও মোসলিম, আবু বাকরাহ (রা) ও ওবাদাহ বিন ছামেত (রা) থেকে আবু দাউদ)। ঐ একই শব্দ মাসীহ রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য নবী ঈসা (আ) সম্বন্ধেও ব্যবহার কোরেছেন’।[১৭]

পর্যালোচনা : (ক) আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ‘দাজ্জাল বের হবে এবং একজন মুমিন তার প্রতি মনোনিবেশ করবে’।[১৮] লেখকের দাবি মোতাবেক দাজ্জালের আবির্ভাবের ৪৭৬ বছর হয়ে গিয়েছে।[১৯] তাহলে হাদীছে বর্ণিত এই লোকটিকে হত্যার কাজ দাজ্জাল এখনো করল না কেন?

(খ) ছহীহ বুখারীর অসংখ্য স্থানে ‘মাসীহুদ দাজ্জাল’ শব্দটি এসেছে। তন্মধ্যে একটি হাদীছে এসেছে— ‘একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ মানুষকে দেখলাম যার বাম চোখ কানা যেন তা ফোলা আঙুরের ন্যায়’।[২০] এ হাদীছে স্পষ্টভাবে ‘মাসীহুদ দাজ্জাল’-কে পুরুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আফসোস তিনি মাসীহুদ দাজ্জাল শব্দদ্বয় অবলোকন করতে পারলেও পুরুষ শব্দটি অবলোকন করতে পারলেন না।

(গ) ছহীহ মুসলিমের অসংখ্য স্থানেই ‘মাসীহুদ দাজ্জাল’ শব্দটি এসেছে। তবে ছহীহ বুখারীর উপরিউক্ত হাদীছটি (হা/৫৯০২) ছহীহ মুসলিমেও আছে।[২১] অথচ এখানেও তিনি ‘পুরুষ মানুষ’ শব্দটি এড়িয়ে গিয়েছেন।

(ঘ) আবূ দাউদের একাধিক স্থানে ‘মাসীহুদ দাজ্জাল’ শব্দটি এসেছে। একটি হাদীছে এসেছে, ‘নিশ্চয়ই মাসীহ দাজ্জাল একজন বেটে মানুষ’।[২২] লেখকের উদ্ধৃত উবাদাহ ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত এই হাদীছেও একেবারেই স্পষ্ট ভাষায় দাজ্জালকে ‘একজন বেটে মানুষ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীছ-১৮ : ‘ঈসা (আ) দাজ্জালকে হত্যা কোরবেন [আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকে মুসলিম এবং নাওয়াস বিন সামআন (রা) থেকে মুসলিম ও তিরমিযী]’।[২৩]

পর্যালোচনা : এটি যে হাদীছে এসেছে, সেখানেও দাজ্জালের পুরুষ ব্যক্তি হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ রয়েছে। নাওয়াস ইবনু সামআন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীছটির আলোচনা গত হয়েছে।

দাজ্জাল সংক্রান্ত কতিপয় অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা :

হাদীছ-১ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ.

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তিনটি বিষয় মূল ঈমানভুক্ত। যে বলবে, ‘লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ’ তার ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা। তাকে আমরা পাপের কারণে কাফের আখ্যায়িত করব না এবং তাকে ইসলাম হতে বেরও করে দিব না। আমাকে পাঠানোর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহতভাবে চালু আছে এবং থাকবে। অতঃপর উম্মতের জিহাদকারী দল সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে জিহাদ করবে’।[২৪]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। হাফেয যাহাবী,[২৫] ইবনু হাজার,[২৬] শাওক্বানী,[২৭] আযীমাবাদী,[২৮] উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী,[২৯]

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩২।
১৪. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৫০।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭১২৫, ৭১২৬।
১৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪২।
১৭. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৫১।
১৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৮, ৭২৬৭।
১৯. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ১।
২০. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯০২।
২১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯।
২২. আবূ দাউদ, হা/৪৩২০, হাদীছ ছহীহ।
২৩. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!, পৃ. ৫২।
২৪. আবূ দাউদ, হা/২৫৩২।
২৫. আল-কাশেফ, রাবী নং ৬৩৬১।
২৬. আত-তাকরীব, রাবী নং ৭৭৮৫।
২৭. নায়লুল আওত্বার, ৭/২৫১।
২৮. আওনুল মা‘বূদ, ৭/১৪৭।
২৯. মিরআতুল মাফাতীহ, ১/১৩৪, ১৩৭।

আলবানী[৩০] এবং যুবায়ের আলী যাঈ[৩১] এ হাদীছের রাবী ইয়াযীদ ইবনু আবী নুশবাকে 'মাজহূল' তথা 'অজ্ঞাতপরিচয় রাবী' বলেছেন।

হাদীছ-২ : 'ভয়ংকর যুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে ঘটবে'।[৩২]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। এখানে দুজন সমালোচিত রাবী আছেন।

রাবী-১ : আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম। তার সম্পর্কে ইমামগণ বলেছেন—

(ক) ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني الشامي وقد ينسب إلى جده قيل اسمه بكير وقيل عبد السلام ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط من السابعة আবূ বকর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মারইয়াম... যঈফ। তিনি ইখতিলাত্বে পতিত হয়েছিলেন। তিনি সপ্তম স্তরভুক্ত'।[৩৩]

(খ) শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, قلت: وهذا سند ضعيف من أجل أبي بكر بن أبي مريم كان اختلط 'আমি বলেছি, এই সনদটি যঈফ আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়ামের কারণে। তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল'।[৩৪]

(গ) আযীমাবাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ الشَّامِيُّ قِيلَ اسْمُهُ بُكَيْرٌ وَقِيلَ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ وَقِيلَ بَكْرٌ وَقِيلَ عَبْدُ السَّلَامِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ 'এর সনদে আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম আছেন। আর তিনি হলেন আবূ বকর ইবনু আব্দুল্লাহ আবূ মারইয়াম আল-গাসসানী আশ-শামী। বলা হয়, তার নাম বুকাইর। ...তার হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না'।[৩৫]

(ঘ) আব্দুর রহমান মুবারকপূরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ 'এর সনদে আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম আছেন। তিনি যঈফ রাবী'।[৩৬]

(ঙ) যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন।[৩৭]

রাবী-২ : ইয়াযীদ ইবনু কুত্বাইব।

(ক) তিনি মাজহূল রাবী। যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ তাকে 'মাজহূলুল হাল' বলেছেন।[৩৮]

(খ) ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, يزيد ابن قطيب بموحدة مصغر السكوني مقبول من السادسة 'ইয়াযীদ ইবনু কুত্বাইব... মাক্ববূল রাবী'।[৩৯] অর্থাৎ অন্যের সমর্থন বা সাক্ষ্য পেলে তার হাদীছ মাক্ববূল তথা গ্রহণীয় হবে। নতুবা যঈফ হবে।

হাদীছ-৩ : 'বড় যুদ্ধ এবং মদীনা বিজয়ের মাঝে ছয় বছরের ব্যবধান রয়েছে। আর দাজ্জাল বের হবে সপ্তম বছরের মধ্যে'।[৪০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর রাবী ইবনু আবী হেলাল মাজহূল রাবী।[৪১]

হাদীছ-৪ : 'প্রত্যেক উম্মতে মাজূসী আছে। আর এই উম্মতের মাজূসী তারা, যারা বলে যে, ভাগ্য বলে কিছু নেই। যে এর উপর (ভাগ্য নেই মতবাদে বিশ্বাসের উপর) মারা যাবে, তার জানাযাতে শরীক হবে না। তাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করবে না। আর তারা হলো দাজ্জালের অনুসারী'।[৪২]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ তথা 'কোনো একজন আনছারী ব্যক্তি হতে' বর্ণনা করা হয়েছে। আনছারী ব্যক্তিটির সম্পর্কে কোনো তথ্য আমরা অবগত হতে পারিনি।

হাদীছ-৫ : 'দাজ্জালের বাবা-মা ৩০ বছর অতিবাহিত করবে। তাদের কোনো সন্তান হবে না। অতঃপর তাদের একটি সন্তান হবে, যার চোখ হবে অন্ধ। সে অধিক অনিষ্টকারী এবং কম উপকারী হবে। তার দুচোখ ঘুমাবে। কিন্তু তার অন্তর ঘুমাবে না। তার পিতা হবে লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের। তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের মতো। তার মা হবে মোটা, স্থূলকায়'।[৪৩]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জাদ'আন যঈফ রাবী।[৪৪] অপর রাবী হাম্মাদ ইবনু সালামাহও সমালোচিত। তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল এবং তিনি সমালোচিত রাবী।[৪৫]

হাদীছ-৬ : 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা হতে মুক্তি পাবে'।[৪৬]

---

৩০. যঈফ আবূ দাঊদ, হা/৪৩৭, ২/৩১১।
৩১. আবূ দাঊদ, ৩/৭৯।
৩২. আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৫; তিরমিযী, হা/২২৩৮।
৩৩. আত-তাকরীব, রাবী নং ৭৯৭৪।
৩৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/১২৮১।
৩৫. আওনুল মা'বূদ, হা/৪২৯৫-এর হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র.।
৩৬. তুহফাতুল আহওয়াযী, হা/১০১২, ২২৩৮।
৩৭. আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৫, ৪/২৯৪।
৩৮. আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৫, ৪/২৯৪।
৩৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৭৬৪।
৪০. আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৬।
৪১. হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ, আনওয়ারুছ ছহীফা, পৃ. ১৫৩।
৪২. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯২।
৪৩. তিরমিযী, হা/২২৪৮; মিশকাত, হা/৫৫০৩।
৪৪. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪৭৩৪।
৪৫. বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন : মুহাক্কিক্ব ইরশাদুল হক্ব আসারী রচিত আহাদীছে হিদায়া ফান্নী ওয়া তাহক্বীক্বী হাইসিয়াত, পৃ. ৯৯-১০৩। (গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশের অপেক্ষায়)।
৪৬. তিরমিযী, হা/২২৬৮; মিশকাত, হা/২১৪৬।

তাহক্বীক্ব : এটি শায বর্ণনা। সুতরাং যঈফ। শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ শায বলেছেন।[৪৭] যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ 'শায' বলেছেন।[৪৮]

সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত বা শেষের আয়াতসমূহ নয়। বরং প্রথম ১০ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের ফেতনা হতে মুক্তি পাওয়ার হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটি নিম্নরূপ—

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

আবূ দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত হিফয করবে সে দাজ্জাল হতে মুক্তি পাবে'।[৪৯]

হাদীছ-৭ : 'দাজ্জাল ও মাহদী একই ব্যক্তি'।[৫০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার। যা যঈফ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত।[৫১]

হাদীছ-৮ : 'দাজ্জাল জাসাদ তথা রূহবিহীন সত্তা হবে'।

তাহক্বীক্ব : একথা কোনো হাদীছে বর্ণিত হয়নি। তবে কিছু লেখক এমনটা দাবি করেছেন।[৫২]

জাসাদ মানে আত্মাবিহীন শরীর কথাটি হাদীছবিরোধী। আমরা যদি হাদীছে যাই, তাহলে এর জবাব পেয়ে যাব। যেমন—

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.

'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন অঞ্জলি পানি নিলেন এবং তা তার মাথায় ঢাললেন। অতঃপর তিনি তার সারা দেহে প্রবাহিত করলেন'।[৫৩] এই হাদীছে দেহ বুঝাতে جَسَد (জাসাদ) শব্দটি এসেছে। তাহলে কি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দেহ আত্মাবিহীন ছিল? যদি কেউ বলে যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মুবারক আত্মাবিহীন ছিল, তাহলে কি তার ঈমান থাকবে? অবশ্যই থাকবে না। কেননা এটা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নিতান্তই ভুল আক্বীদা। আর এটা জানা কথা যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমকে সঠিক আক্বীদা পোষণ করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي القَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ، مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনু হারেছা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু শহীদ হয়, তাহলে জা'ফর ইবনে আবূ তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু সেনাপতি হবে। যদি জা'ফর রাযিয়াল্লা-হু আনহু শহীদ হয়ে যায়, তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সেনাপতি হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, ঐ যুদ্ধে তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। আমরা জা'ফর ইবনু আবূ তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে অনুসন্ধান করলাম। এরপর আমরা তাকে শহীদদের মাঝে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে বর্শা ও তীরের ৯০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম।[৫৪]

উক্ত হাদীছেও جَسَد (জাসাদ) শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। ছাহাবী জা'ফর ইবনু আবূ তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু কি তাহলে আত্মাবিহীন ব্যক্তি ছিলেন? নাঊযুবিল্লাহ। তাছাড়াও হাদীছে দাজ্জালকে সরাসরি যুবক ও পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, তার দেহে রূহ আছে। সুতরাং 'দাজ্জাল আত্মাবিহীন সত্তা' বলা চরম বিভ্রান্তিকর।

হাদীছ-৯ : 'দাজ্জাল জেরুজালেম হতে বের হবে'।

তাহক্বীক্ব : এর পক্ষে কোনো জাল হাদীছও নেই; ছহীহ বা হাসান তো দূরের কথা। আমরা এর পক্ষে কোনো জাল সনদও পাইনি। বরং বাইবেলে এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।[৫৫]

হাদীছ-১০ : 'দাজ্জাল জেরুজালেম হতে শাসনকার্য চালাবে'।

তাহক্বীক্ব : এটিও ভিত্তিহীন দাবি। এটি কোনো হাদীছ নয়। বরং কিছু বক্তা বাইবেলের কথাগুলোকে হাদীছের বক্তব্য মনে করে এ জাতীয় আজগুবি কথা বিশ্বাস করেছেন ও তা প্রচার করে যাচ্ছেন।

হাদীছ-১১ : 'সুলায়মানের সিংহাসনে বসে থেকে দাজ্জাল সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে'।

তাহক্বীক্ব : এটি হাদীছ তো নয়ই; বরং চরম হাস্যকর কথা। যেহেতু হাদীছে এ জাতীয় কোনো বক্তব্য নেই, সেহেতু এমন দাবি করা মিথ্যাচারের নামান্তর।

(চলবে)

---

৪৭. সিলসিলা যঈফা, হা/১৩৩৬।
৪৮. তাহক্বীক্ব মিশকাত, ১/৬৯৬।
৪৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৯; মিশকাত, হা/২১২৬; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১০২১।
৫০. ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩৯।
৫১. সিলসিলা যঈফা, হা/৭৭।
৫২. ইমরান নজর হুসেন, দাজ্জাল, কুরআন ও ইতিসহাসের সূচনা, পৃ. ৮৫।
৫৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৫৬।
৫৪. ছহীহ বুখারী, হা/৪২৬১।
৫৫. যাখারিয়া, ৯ : ৯ : ১০; ইযখিল, ৩৭ : ২১ : ২২।

জীবন যদি হতো তাদের মতো!

*-সাঈদুর রহমান**

জীবনে সফল হতে হলে লক্ষ্য স্থির করতে হয়, নচেৎ সফলতা অর্জন করা দুরূহ হয়ে যায়। কেউ যদি সফলতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে কোনো একজন মহৎ গুণের অধিকারী মানুষের অনুসরণ করা প্রয়োজন। ছাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্য ছিল চিরসুখের আবাস জান্নাতে যাওয়ার; তাই তো তারা মডেল বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সৃষ্টিকুলের সেরা মানব মুহাম্মাদ ﷺ-কে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নবী ﷺ-এর আদর্শকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। যত বাধাবিপত্তিই আসুক না কেন রাসূল ﷺ-এর কথা তাদের নিকট শিরোধার্য। রাসূল ﷺ-এর কোনো কথা শুনার সাথে সাথে তা বাস্তবায়নের হিড়িক পড়ে যেত। কার আগে কে করবে তা নিয়ে অন্যরকম একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। নিজেদের জীবন থেকেও অধিক ভালোবাসতেন রাসূল ﷺ-কে। তিনি পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে কী করতেন, তার খোঁজখবর নিতেন। তাঁর আদেশে রণক্ষেত্রে মরণপণ লড়াই করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এজন্যই তো তারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছেন। আমরা কি নবী ﷺ-এর আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি? ছাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে যতটুকু ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন, আমরা কি ততটুকু করি? আমাদের জীবনটা যদি তাদের মতো হতো! আজকে আপনাদেরকে কিছু হাদীছ শুনাবো, ছাহাবীগণ ইসলামের ব্যাপারে কেমন ছিলেন। তারা কি শুধু সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতার সময়ই ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছেন, না-কি সর্বাবস্থায়? তারা রাসূল ﷺ-এর কথাকে কি সর্বাবস্থায় শ্রদ্ধা করতেন, না-কি করতেন না?

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি লক্ষ্য করে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরো সংগ্রহ করে তার হাতে রাখে’। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্থান করলে লোকটিকে বলা হলো, তোমার আংটিটি তুলে নাও, এর দ্বারা উপকার লাভ করো। তিনি বললেন, না। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ওটা নেব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো ওটা ফেলে দিয়েছেন।[১] এই হাদীছের প্রতি একটু মনোযোগ দিন, ছাহাবী দেখলেন যে, নবী ﷺ রাগ করেছেন, আর রাগবশত তিনি তার আংটি ফেলে দিয়েছেন। নবী ﷺ যখন ঐ স্থান ত্যাগ করেন, তখন অন্যান্য ছাহাবী বলা সত্ত্বেও তিনি আর ঐ আংটি নেননি। সুবহানাল্লাহ! তিনি বললেন, নবী ﷺ যে আংটি ফেলে দিয়েছেন, সেটা আমি কী করে নিই; আমি যে তাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি! ছাহাবীর স্থানে যদি আমি আপনি হতাম, তাহলে কী করতাম! শুরু করতাম নবী ﷺ-কে নিয়ে নানাবিধ কথা; হয়তো অনেকেই বলে ফেলতাম আপনার কোনো সমস্যা আছে এই আংটি পরাতে? যেমন আপনি কাউকে যদি বলেন, টাখনুর উপরে প্যান্ট পরুন, রাসূল ﷺ টাখনুর নিচে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন; তাহলে আপনি তার থেকে উত্তর পাবেন ‘আপনার কোনো সমস্যা, আর রাসূল ﷺ বলেছেন তো কী হয়েছে? তাঁর সব কথাই মানতে হবে নাকি?’ –নাঊযুবিল্লাহ-

ছাহাবীগণ আমল করার জন্য রাসূল ﷺ-এর কার্যাবলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন; মাঝে মাঝে তাঁর সহধর্মিণীগণকে জিজ্ঞেস করতেন যে, প্রিয় নবী ﷺ-এর আমল কেমন ছিল? আর আমাদের সামনে ভূরিভূরি হাদীছ আছে ভাই, কিন্তু আমরা মান্য করি না; অহেতুক গলাবাজি করি। দুষ্কৃতি কত প্রকার ও কী কী সবই আছে আমাদের হৃদয়ে, কিন্তু তাদের হৃদয়টা ছিল প্রশস্ত, ছিল না কোনো ধরনের সংকীর্ণতা ও প্যাঁচ। ভাই আমাদের জীবনটা তাদের মতো করলে কেমন হয়? বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই, শুধু আমাদের মন-মানসিকতা একটু পরিবর্তন করলেই চলবে। আমরাও পাব আল্লাহর অপরিসীম ভালোবাসা, ফিরে আসবে আমাদের মাঝে ভাতৃত্বের বন্ধন, দূরীভূত হবে হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা ও পরশ্রীকাতরতা। আপনি চমকে যাবেন আরেকটি হাদীছ দেখে—

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৬৫।

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.

নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) তিনি ছবিযুক্ত গদি ক্রয় করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তা দেখতে পেলেন, তখন দরজার উপর দাঁড়িয়ে গেলেন; প্রবেশ করলেন না। [আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)] নবী ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ প্রত্যক্ষ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট এ পাপ থেকে তওবা করছি। নবী ﷺ বললেন, ‘এ গদি কোথা থেকে আসল?’ আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, আপনার উপবেশন ও হেলান দেওয়ার জন্য আমি এটি ক্রয় করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, ‘এসব ছবি নির্মাতাদের ক্বিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা বানিয়েছিলে তা জীবিত করো’। তিনি ﷺ আরও বললেন ‘যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না’।[২]

দেখুন, আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নবী ﷺ-এর ক্রোধ দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সাথে সাথে রাসূল ﷺ-এর কাছে ক্ষমা চান; তিনি কিন্তু ঐ গদিটি নবী ﷺ-এর জন্যই ক্রয় করেছিলেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) মনে মনে অনুভব করেন যে, যদি নবী ﷺ আমার উপর রাগ করে থাকেন, তাহলে আমাকে হাওযে কাওছারের স্বচ্ছ-নির্মল সুপেয় পানি পান করাবে কে, তাঁর সুপারিশের মাধ্যমেই তো আমি অনিন্দ্য সুন্দর ছায়াময় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। যে ব্যক্তি আমার জন্য এত কিছু করবেন, তিনি কি আমার উপর রাগ করে থাকলে হয়; কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে নবী ﷺ-এর ক্রোধ নিবারণের চেষ্টা করেন। ছাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে কত ভালোবাসাতেন! আমরা তো নবী ﷺ-কে কষ্ট দেই, তাঁর সুন্নাতকে গলা চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করি, তাঁর মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না। আজকের নারীরা যদি নারী ছাহাবীদের মতো হতো, তাহলে দাম্পত্য জীবনে কখনোই মনোমালিন্য ও বিদ্বেষের ঘনঘটা আসত না, সবসময় বিরাজ করত স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে অনাবিল সুখ-শান্তি। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) স্বামীর রাগ নিবারণের লক্ষ্যে কতকিছুই না করলেন। কয় আপনার স্বামী তো রাগ করেছে, আর আপনি বিরক্তির ভাব নিয়ে অন্য দিকে ফিরে আছেন? অতি সত্বর তার নিকট ভুল স্বীকার করুন। বলুন, আর কখনো এমন হবে না; আমি না জেনে করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে পবিত্র করুন। বর্তমান সময়ের নারীরা সাধারণত ভুল স্বীকার করতে চায় না, উল্টো আরও রাগ করে থাকে, চলে দাম্পত্য জীবনে বিড়ম্বনা। প্রিয় বোন আমার! নবী ﷺ-এর কথাকে আপনার ক্রোধের উপর প্রাধান্য দিন; তিনি তো বলেছেন যে, ‘আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা দিতে বললে নারীদের বলতাম যেন তারা স্বামীকে সেজদা করে’।[৩]

সুবহানাল্লাহ! ছাহাবীগণ ইসলামের বিধানকে খুব মযবূত করে পালন করতেন। দুঃখ-কষ্ট যতই আসত, তারা কখনোই পিছপা হতেন না, চলতেন ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে। বিপদ নামক বৈশাখী ঝড় তাদের কখনো হেলাতে পারত না, ছালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। তাদের বিশ্বাসের শেকড়টা ছিল খুবই মযবূত। তাই সহস্র মুছীবতেও তারা উপুড় হয়ে পড়তেন না; নবী ﷺ-এর বাতলানো পথে চলতেন।

উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, ‘আমার প্রিয়তম সঙ্গী আবূ সালামার প্রয়াণে আমি দুঃখ-কষ্টে নীরব-নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে যাই, যেন আমি শোকের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি; ক্ষণিকের জন্য আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল বৈশাখী ঝড়, আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, বাকরুদ্ধকর পরিস্থিতি। বারবার মনে পড়ছে তার ভালোবাসার কথা, তাকে ছাড়া কি আমি একা একা থাকতে পারব? যে আমার কষ্টের সময় ছিল সমবেদনা জ্ঞাপনকারী, আর সুখের সময় ছিল প্রফুল্লতা দানকারী। আমি হেরে গিয়ে ভয় পেলে যে আমাকে অভয় দিতেন ও সাহস যোগাতেন, আমার বিজয়ই ছিল যার বিজয়। কোনো ভুল করলে কটুকথা না বলে যিনি আমার ভুল শুধরে দিতেন; আমাকে করতেন বিভিন্ন কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা। যিনি ছিলেন আমার প্রিয় সন্তানদের শ্রদ্ধাভাজন পিতা; ইবাদতে আমি উদাসীন হয়ে গেলে স্মরণ করিয়ে দিতেন আল্লাহর কথা; হাজার কাজের ব্যস্ততার মাঝেও যিনি ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দিতেন আমার গায়ে। কত আনন্দই না পেতাম তার সংস্পর্শে! তিনি তো আমাকে ছেড়ে পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে! আমি কীভাবে থাকব? কে আমাকে ও আমার প্রিয় সন্তানদের দেখভাল করবে? এরকম হাজারো দুশ্চিন্তা উঁকি দিল আমার তনুমনে; পরক্ষণেই মনে পড়ে নবী ﷺ-এর বাণীর কথা। তিনি বলেন, ‘কারো নিকট বালা-মুছীবত আসলে সে যদি এই দু‘আটি পড়ে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে এর চাইতেও উত্তম জিনিস দান করবেন। দু‘আটি হলো—

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

‘আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর সমীপেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদে পুণ্য দান করুন এবং এর চাইতেও উত্তম জিনিস দিন’। এই দু‘আটি পড়ে তিনি বলেন যে, আমি

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬১।

৩. তিরমিযী, হা/১১৫৯; আবূ দাঊদ, হা/২১৪০; হাসান।

সাময়িকের জন্য কল্পনার জগতে চলে গেলাম। আবূ সালামা তো একজন অমায়িক লোক, তার মতো কি কেউ হতে পারে? তিনি আমার প্রতি কতই না খেয়াল রাখতেন? কতই না আবেগময় কথা শুনাতেন? তিনি আমার হৃদয়ে বসন্তের ফল্গুধারা বয়ে দিতেন। এরকম হাজারো বাণী আমার মানসপটে দোলা দিচ্ছিল। এভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হলো। একদিন আমাকে প্রেয়সীরূপে পাওয়ার জন্য নবী ﷺ বিয়ের প্রস্তাব দেন। ঐ সময় আমার অবস্থা হলো 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি'-এর ন্যায়। মরুচারি এক ফোঁটা পানি পেয়ে যেমন পুলকিত হয়, তার চেয়েও বেশি আমি আপ্লুত হয়েছিলাম ঐ দিন। শ্রেষ্ঠ মানব আমার প্রিয়তম হবে? হবে আমার দুর্দিনের সাথি? আমি তো ভেবেই আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি! আমার এই আনন্দের কথা কার কাছে বলি! আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার স্বামী! আমি কালক্ষেপণ না করে সাথে সাথে 'হ্যাঁ' বলে দিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম নবী ﷺ-ই তো আবূ সালামার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর কথা বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন।[৪]

ছাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর ডাকে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। জীবন, পরিবার ও প্রীতির মায়াজালে আবদ্ধ থাকতেন না; ছুটে চলতেন তাঁর আহ্বানে দুরন্ত গতিতে; কোনো বাধাই তাদের প্রতিবন্ধক হতো না। সবকিছুর আগে রাসূল ﷺ-এর কথাকে প্রাধান্য দিতেন। এমনি এক চিত্র পাই আমরা হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি ঘটনা থেকে। উহুদ যুদ্ধের দিন যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। কাফেরশক্তি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল, মদীনার চারদিকে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। এদিকে মুনাফেক্বশক্তি গোপনে অপপ্রচারে লিপ্ত। কাফেররা তিন হাজার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী নিয়ে ধেয়ে আসছে মুসলিমদের নির্মূল করার জন্য। কী এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এ সময়ের নিরস্ত্র মুসলিমদের; ভাবতেও অবাক লাগে! নবী ﷺ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন এ পরিস্থিতিতে কী করা যায়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। একজন ঘোষক ঘোষণা করলেন যে, সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত হও; আর এটা নবী ﷺ-এর আদেশ। এই ঘোষণাটি হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্ণকুহরে এসে সবেগে আঘাত হানে। ঐ সময় তিনি ছিলেন নববর; আগের দিন সবেমাত্র বিয়ে করেছেন; এখন পর্যন্ত ফরয গোসল করেননি। এদিকে রাসূল ﷺ-এর আদেশ আর ঐদিকে ফরয গোসল, কোনটাতে তিনি প্রাধান্য দিবেন? তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'প্রেয়সী আমার! হৃদয়ের স্পন্দন! আমার তো ডাক পড়েছে; যেতে চায় না মন, তবুও যেতে হবে। জানি না দেখা হবে কি না। এ জগতে যদি আমাদের দেখা আর না হয় পরজগতে অবশ্যই হবে। আমাকে যেতে হবে; হ্যাঁ, আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। আমার নয়নমণি চক্ষুশীতলকারী রাসূল ﷺ তো আমাকে ডেকেছেন। বিদায় হে প্রাণের স্পন্দন! বিদায়! তিনি আর কালবিলম্ব না করে স্নানবিহীন রওনা দিলেন রাসূল ﷺ-এর পানে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ করতে করতে একপর্যায়ে তিনি শাহাদাতের সুধা পান করেন। যুদ্ধ শেষে নবী ﷺ শহীদদের দেহ কবরস্থ করার জন্য ছাহাবীদের নির্দেশ দেন। এদিকে হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে, তার মাথা থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে। এ দৃশ্যটি ছাহাবীরা দেখে হতভম্ব হয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন।[৫]

সুবহানাল্লাহ! ভাবুন তো, হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্থানে আমি আপনি হলে কী করতাম! যাই করতাম না করতাম, ঘোষণা শুনে কমপক্ষে বলতাম পাঁচ মিনিটে ফরয গোসলটা সেরে নেই; তারপর রওনা দেই। দেখুন, আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে কত ফারাক্ব, কত ব্যবধান! আমরা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতকে গুরুত্ব দেই না, কোনো আমলেই নেই না, আর তারা প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কেউ যদি রাসূল ﷺ-এর কোনো নির্দেশকে অবজ্ঞা করত বা অমান্য করত, তাহলে ভালোবাসার কোনো মায়াজালই তাদের বাধা দিত না; তারা ঐ সময় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে রাসূল ﷺ-এর কথাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। চাই ঐ ব্যক্তিটা নিজের কোনো আপনজন হোক বা পর। এমনি একটি দৃশ্য অবলোকন করেছি একজন ছাহাবীর জীবনী থেকে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা একদিন বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমরা নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করো না'। তার এক ছেলে একথা শুনে চট করে বলে উঠল, 'আমি নিষেধ করব'। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'কী আশ্চর্য! আমি তোমাকে নবী ﷺ-এর হাদীছ শুনাচ্ছি আর তুমি তার বিপরীত কথা বলছ। আল্লাহর শপথ! তোমার সাথে কখনোই কথা বলব না'।[৬]

ভাবুন তো এই স্থানে আপনি থাকলে কী করতেন? অবশ্যই আমার আপনার উপর জেঁকে বসত সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালোবাসার মায়াজাল। আমি আপনি কী সেই মযবূত জালের বাঁধন ছিন্ন করে বের হতে পারতাম? পারতাম কি কলিজার টুকরো ছেলেকে বলতে, আমি তোমার সাথে কোনো সম্পর্কই রাখব না। ছাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন, অনমনীয়; চাই সে যেই হোক না কেন।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৬নং পৃষ্ঠায়)

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৮।

৫. বায়হাক্বী, ৪/১৫।

৬. ইবনু মাজাহ, হা/১৬।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী

*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(শেষ পর্ব)

দ্বিতীয়ত, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা বলেন, الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الائمة 'সঠিক কথা হলো— মৃত ব্যক্তি যাবতীয় দৈহিক ইবাদতের মাধ্যমে উপকৃত হবে। যেমন— ছালাত, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত। অনুরূপভাবে আর্থিক ইবাদতগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হবে ইমামদের ঐকমত্যে। যেমন— দান-ছাদাক্বা, দাস মুক্ত করা। এ ছাড়া আরও অন্যান্য সৎ আমল'।[১]

তৃতীয়ত, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম বর্ণনা করেন, মৃতরা জীবিতদের কর্মের মাধ্যমে দু'টি কারণে উপকৃত হবে-

১ম কারণ : মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় জীবিত ব্যক্তির মাধ্যমে আমলগুলো করার কারণ তৈরি করার কারণে (মাধ্যমে)।

২য় কারণ, মৃতদের জন্য মুসলিমদের দু'আ, ক্ষমা চাওয়া, দান-ছাদাক্বা করা, হজ্জ করা...। আহলে ইলমগণ দৈহিক ইবাদত (মৃতদের কাছে পৌঁছানো) নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। যেমন— ছিয়াম, ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার। ইমাম আহমাদ ও জমহূর সালাফগণ ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারে মত দিয়েছেন। সাথে ইমাম আবূ হানীফা -এর কতিপয় সাথী এ মত ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع 'মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় ইবাদতগুলো সম্পাদন করার কারণ তৈরি করা ছাড়াই ইবাদতগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার দলীল হলো- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং শরীআতের মূলনীতি'।[২]

অতঃপর তিনি আরো বলেন, মৃতদের জন্য দু'আ, দান-ছাদাক্বা, ছিয়াম, এবং হজ্জ এর ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। যারা এ বিষয়ে বিরোধিতা করে, তাদের তিনি প্রত্যাখান করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ দলীলগুলো জীবিত ব্যক্তির উৎসর্গীত আমল মৃতদের নিকটে পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রমাণিত। এটা হচ্ছে রায় (ক্বিয়াসের) ক্ষেত্রে।[৩] ছওয়াবের হক্বদার আমল সম্পাদনকারীরা। আমল সম্পাদনকারীরা যখন মুসলিম ভাইকে দান করে দিবে, তখন তাকে বাধা দেওয়া হবে না। তেমনিভাবে তার জীবদ্দশায় ধনসম্পদ দান করতে এবং মৃত্যুর পর তার জন্য মুক্ত করতে বাধা দেওয়া হবে না'।[৪]

চতুর্থত, তিনি আর-রওযুল মুরবে' নামক গ্রন্থে বলেন, وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك 'যে কোনো সৎ আমল: দু'আ, ক্ষমা চাওয়া, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, কুরআন তেলাওয়াত বা এ ছাড়া আরও অন্যান্য সৎ আমল মুসলিম ব্যক্তি সম্পাদন করে মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য হাদিয়া (উৎসর্গ) করে দিলে, তারা উপকৃত হবে'।[৫+৬] আল্লামা ইবনু উছায়মীন বলেন, لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه (أي الحي) عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله 'জীবিত ব্যক্তি অন্যের উৎসর্গীত হজ্জের মাধ্যমে উপকৃত হবে এক শর্তে। তা হলো— [জীবিত ব্যক্তি] হজ্জ পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে। যে অক্ষমতা দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায় না'।[৭]

পঞ্চমত, আল্লামা মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন বলেন, 'মৃতদের নিকট সকলের ঐকমত্যে চার ধরনের (প্রকার) ইবাদত পৌঁছে। তা হলো— (১) দু'আ (প্রার্থনা)। (২) যে ওয়াজিব ইবাদতগুলো স্থলাভিষিক্ত হয় (অন্যের বদলে করা যায়)। (৩) দান-ছাদাক্বা। (৪) দাস মুক্ত করা। এ ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে।

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গীত এ চার ধরনের ইবাদত ছাড়া অন্যান্য উৎসর্গীত ইবাদতের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে না। তবে সঠিক কথা হলো— মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে তার জন্য উৎসর্গীত প্রতিটি আমলের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে...'।[৮]

অতঃপর তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ 'আর মানুষ তাই পায়, যা সে করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*। উক্ত আয়াতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, -

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. আল-আখবারুল ইলমিয়্যাহ মিনাল ইখতিয়ারিল ফিক্বহিয়্যাহ, পৃ. ১৩৭।

২. ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, ২/৪৫০; ইবনুল ক্বাইয়িম 'কালাম'; অনুরূপ 'তাহযীবুস সুনান, ৩/২৭৯-২৮২-এ বর্ণনা করেছেন।

৩. এখানে 'রায়' বা 'ক্বিয়াস'-এর কোনো অবকাশ নেই। আলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ 'দ্বীন যদি বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই হতো, তাহলে মোজার উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ মাসাহ করাই উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর দিকেই মাসাহ করতেন' *(আবূ দাঊদ, হা/১৬২; মিশকাত, হা/৫২৫, সনদ ছহীহ)*। -অনুবাদক

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, ২/৪৫০।

৫. আর-রওযুল মুরবে', আব্দুর রহমান আল-ক্বাসিম এর হাশিয়াসহ, ২/১৩৮।

৬. ইবনু ক্বাসিম, আর-রওযুল মুরবে' গ্রন্থের টীকাতে ইবনুল ক্বাইয়িম-এর কথা বর্ণনা করেছেন যে, সেগুলো প্রত্যেকটিতেই ছওয়াব পৌঁছায় *(হাশিয়া ইবনুল ক্বাসিমসহ, ২/১৩৯)*।

৭. আশ-শারহুল মুমতে', ৫/৪৬৬।

৮. ইবনু উছায়মীন, মাজমূ' রাসায়েল, ১৭/২৫৫।

আল্লাহই অধিক জ্ঞাত- মানুষ অন্যের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কিছুই হক্বদার হবে না। তেমনিভাবে মানুষ অন্যের পাপের বোঝার কিছুই বহন করবে না। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষের কাছে অন্যের প্রচেষ্টার ছওয়াব পৌঁছাবে না। বরং একজনের আমলের ছওয়াব অন্যের কাছে পৌঁছাবে এবং তা দ্বারা উপকৃত হতেও পারবে, যখন এমনটি ইচ্ছা করবে'।[৯]

অতঃপর তিনি রহিমাহুল্লাহ দু'আ, মৃতের পক্ষ থেকে দান-ছাদাক্বা, ছিয়াম, হজ্জ ও কুরবানী করার ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। অতঃপর যারা সন্তানের আমলের ব্যাপারে বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করে, তিনি তাদের কথার জবাব দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, সন্তান ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। যেমন- নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুবরুমা কে? সে বলল, আমার ভাই বা আমার নিকটতম ব্যক্তি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি নিজের জন্য হজ্জ করেছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ 'আগে তোমার জন্য হজ্জ করো, তারপর শুবরুমার জন্য হজ্জ করো'।[১০+১১] তিনি বর্ণনা করেন, এ হাদীছের আলোকে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে নফল বা ফরয হজ্জ করা বৈধ প্রমাণিত হয়। কেননা, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তিকে শুবরুমার পক্ষ হতে হজ্জ করা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ চাননি; হজ্জ নফল না ফরয? শুবরুমা জীবিত ছিল বা মৃত ছিল? তারা বলে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে ফরয হজ্জ করা বৈধ, যা স্পষ্ট ছহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত?'।[১২]

ষষ্ঠত, শায়খ ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, মৃত ব্যক্তির কাছে ছাদাক্বা, দু'আ, ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), হজ্জ, উমরা এবং ঋণ পরিশোধের ছওয়াব পৌঁছাবে।[১৩] তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তির নিকটে যে ইবাদতগুলোর ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারে দলীল বর্ণিত হয়েছে, সেসব ব্যাপারেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা, ইবাদত হচ্ছে তাওক্বীফী, যা প্রমাণ ছাড়া করা জায়েয নেই'।[১৪] তিনি বর্ণনা করেছেন যে, দান-ছাদাক্বা করার মাধ্যমে জীবিত-মৃত উভয়ে উপকৃত হবে। অনুরূপভাবে, দু'আ, হজ্জ, উমরার মাধ্যমেও উপকৃত হবে। তবে হজ্জ, উমরা পালনে জীবিত ব্যক্তি অক্ষম হলে তার পক্ষ হতে তা আদায় করা হবে।

শায়খ ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, এ হাদীছগুলো প্রমাণ করে, মৃত ব্যক্তি সৎ আমলগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে। দান-ছাদাক্বা, হজ্জ, ছিয়াম এবং দু'আ এ ছাড়া আরো অন্যান্য ইবাদত। এগুলোর প্রত্যেকটির মাধ্যমে মুসলিমরা উপকৃত হতে পারবে। তবে অমুসলিমদের জন্য দু'আ করা যাবে না এবং তাদের পক্ষ হতে দান করাও যাবে না। তবে বিশুদ্ধতার নিকটতম বক্তব্য হচ্ছে -*আল্লাহই অধিক অবগত*-, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরআন তেলাওয়াত ও ছালাত আদায় করা শরীআতসম্মত নয়। কেননা, ইবাদত হচ্ছে তাওক্বীফী। আল্লাহ তাআলা যে ইবাদতগুলো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা শরীআতসম্মত করেছেন, শুধুমাত্র সে ইবাদতগুলোই তাদের কাছে পৌঁছাবে। যেমন— দু'আ, হজ্জ, উমরা, ছালাত এবং ছিয়াম ইত্যাদি'।[১৫]

ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ যে মতটি ব্যক্ত করেছেন, সে মতটি হলো অধিকতর অগ্রাধিকরযোগ্য। কারণ ইবাদত হচ্ছে তাওক্বীফী। মৃতদের নিকটে নিম্নবর্ণিত সৎ আমলগুলোর ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারে দলীল এসেছে— (১) দু'আ ও ইস্তেগফার। (২) ফরয ও নফল হজ্জ। (৩) ফরয ও নফল উমরা। (৪) ফরয ও নফল দান-ছাদাক্বা। কুরবানী দান-ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। (৫) ফরয ছিয়াম। আর নফল ছিয়ামের ব্যাপারেও দলীল এসেছে।[১৬] (৬) ফরয ও নফল দাস মুক্ত করা। (৭) মৃতদের কৃত ওয়াজিবগুলো। যেমন— মানত করা, কাফফারা আদায় করা, ঋণ পরিশোধ করা। এছাড়া আরও অন্যান্য ইবাদত, যেগুলোর ব্যাপারে দলীল এসেছে। আল্লাহই অধিক অবগত'।[১৭]

وصلى الله و سلم وبارك على نبينا محمد، وعلى أله وأصحابه أجمعين.

---

৯. ইবনু উছায়মীন, মাজমূ' রাসায়েল, ১৭/২৫৫-২৫৬।

১০. আবূ দাঊদ, হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ, হা/২৯০৩, আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

১১. ইবনু উছায়মীন, মাজমূ' রাসায়েল, ১৭/২৫৬-২৬৬।

১২. ইবনু উছায়মীন, মাজমূ' রাসায়েল, ১৭/২৭৪-২৭৫, এ সম্পর্কে উপকারী আলোচনাসমূহ (১৭/২২২-২৮০)।

১৩. ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৩/২৪৯-২৫০, ২৬০।

১৪. মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৩/২৫৮, তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, সর্বোত্তম বিষয় হলো তাওয়াফ হাদিয়া না দেওয়া (১৩/২৫৮)। আর কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াবও হাদিয়া না দেওয়া (১৩/২৫৯, ২৬৬) এবং ফরয ও নফল ছালাতও হাদিয়া না দেওয়া (১৩/২৫৯, ২৬০, ২৬১), তবে কারো পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরা করা কালে তওয়াফের দু'রাক'আত ছালাত হাদিয়া দেওয়া যায়। কেননা দু'রাক'আত ছালাতও তওয়াফের অন্তর্ভুক্ত (১৩/২৬০)।

১৫. আমি মুনতাক্বাল আখবার গ্রন্থের দারসে (হা/১৯২১, ১৯২৫)-তে শায়খ (ইবনু বায)-কে বলতে শুনেছি।

১৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল আছ ইবনু ওয়ায়েল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললেন, 'সে যদি তাওহীদের উপর মারা যেত, তাহলে তোমরা তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে তা তার উপকারে আসত' *(আহমাদ শাকের, শরহু আহমাদ, হা/৬৭০৪, আহমাদ শাকের বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ। আবূ দাঊদ এর সনদে, হা/২৮৮৩)*; বায়হাক্বী ৬/২৭৯; ইমাম আহমাদ বলেন, সনদ হাসান; আলবানী, আহকামুল জানায়েয, পৃ. ২১৮।

১৭. ইবনু তায়মিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৪/৬, ৩/৩২৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, ২/৪৩৫, ৫০০; ইবনুল ক্বাইয়িম, তাহযীবুস সুনান, ৩/৭৯,২৮২; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৩/৫২১,৫২২; শারহুল কাবীরসহ আল-মিফতাহু ওয়া ইনছাফ, ৬/২৫৭, ২৬৫; আল-কাফী, ২/৮২; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ২/৭৮২,৭৮৬; ইবনু তায়মিয়্যা, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যা, পৃ. ১৩৭; আব্দুর রহমান আল-ক্বাসিম, আর-রওযুল মুরবে' হাশিয়াসহ, ২/১৩৮, ১৪০; তিনি ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা এবং ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুমাল্লাহ থেকে অর্থপূর্ণ আলোচনা বর্ণনা করেছেন; ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৩/২৪৯, ২৮৪; ইবনু উছায়মীন, মাজমূ' রাসায়েল, ১৭/২৩৯,২৭৬; ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল বুহূছিল ইলমিয়্যা, ৯/১৫, ৬৯; ইবনু উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে', ৫/৪৬৯-৪৭০; আলবানী, আহকামুল জানায়েয, পৃ. ২১২, ২২৬।

আশূরায়ে মুহাররম : গুরুত্ব ও ফযীলত

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

আরবী বছরের প্রথম মাস মুহাররম। আরবরা এ মাসকে ‘ছফরুল আউয়াল’ তথা প্রথম ছফর নামকরণ করে নিজেদের ইচ্ছামতো যুদ্ধ-বিগ্রহসহ বিভিন্ন কাজকে হালাল ও হারাম করত। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ অবস্থাকে নিষিদ্ধ করে এ মাসের ইসলামী নামকরণ করেন ‘শাহরুল্লাহিল মুহাররম’ তথা ‘মুহাররম আল্লাহর মাস’ নামে। এ মাসের ১০ তারিখ আশূরা বলে পরিচিত। নিঃসন্দেহে আশূরার দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার দিন।

মুহাররম মাসের গুরুত্ব :

মুহাররম মাস হিজরী সনের ১২ মাসের প্রথম মাস, যা হারাম বা পবিত্র মাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বছরের ১২টি মাস সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

‘নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় ১২টি মাস, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো! আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে আছেন’ *(আত-তওবা, ৯/৩৬)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। এতে নিষিদ্ধ জিনিসের জন্য ক্বিছাছ (প্রতিবদলা) এর বিধান রয়েছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৪)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ ১২টি মাস সম্পর্কে বলেন,

﴿الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ﴾

‘আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল, আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। ১২ মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুলক্বা‘দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম। এ তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযার, যা জুমাদা (ছানিয়াহ) ও শা‘বান মাসের মধ্যে অবস্থিত’।[১] ক্বাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ এ অংশ থেকে বুঝা যায়, অন্য মাসের চেয়ে এ মাসে যুলুম করা মহাঅপরাধ বা বড় গোনাহর কারণ। যদিও যুলুম সর্বদায় কাবীরা গোনাহ।

আশূরা কী?

আশূরা শব্দটির বিশ্লেষণ নিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের নিকট মুহাররম মাসের দশম তারিখই আশূরার দিন। এটা আরবী শব্দ (عشر) আশারা হতে নির্গত, যার অর্থ হলো দশ। অতএব, মুহাররম মাসের দশম তারিখে ছিয়াম রাখার নামই হলো আশূরার ছিয়াম।[২]

আশূরার ছিয়ামের প্রেক্ষাপট :

মহান আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ এই দিনে ছিয়াম রাখা হয়। কারণ, মহান আল্লাহ এই দিনে তাঁর নবী মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ক্বওমকে ফেরাউন ও তার দলবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। হাদীছে এসেছে—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوْا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে ইয়াহূদীদের দেখতে পেলেন যে, তারা আশূরার ছিয়াম পালন করছে। তিনি বললেন, এটা কী? তারা বলল, ‘এটা একটা ভালো দিন, এটা এমন একদিন, যেদিন আল্লাহ বানূ ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম এই দিন ছিয়াম পালন করেছেন’। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের চেয়ে মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে অধিক হক্বদার’। এরপর তিনি নিজে এই ছিয়াম পালন

১. ছহীহ বুখারী হা/৩১৯৭।
২. মিরআতুল মাফাতীহ, ৭/৪৫।

করেন এবং ছাহাবীদেরকেও ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন।[৩] মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এ হাদীছটির বর্ধিত অংশে বলা হয়েছে, আশূরা এমন একটি দিন, যেদিনে নূহ আলাইহিস সালাম-এর কিশতী জুদী পর্বতে অবতরণ করেছিল। ফলে তিনি শুকরিয়াস্বরূপ এ দিনটিতে ছিয়াম রাখেন। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতের মাঝেও আশূরায়ে মুহাররমে ছিয়াম রাখার ইবাদত চালু ছিল।

আশূরার ছিয়ামের হুকুম :

ইসলামের পূর্বযুগ হতেই এ ছিয়ামের প্রচলন ছিল। অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পর এটা সকলের ঐকমত্যে সুন্নাত। কিন্তু রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে তার হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ ওয়াজিব বলেছেন, আবার কেউ সুন্নাত বলেছেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ ছিয়াম রেখেছেন এবং ছাহাবীদের রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কুরায়শরা জাহেলী যুগে আশূরার দিন ছিয়াম পালন করত। এসময় আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এ দিনে ছিয়াম রেখেছেন। অতঃপর তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি নিজে এ ছিয়াম পালন করেন এবং ছাহাবীদের তা পালন করার হুকুম দেন। তারপর যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয হয়, তখন তিনি আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেন। অতঃপর যার ইচ্ছা সে তা রাখত আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।[৪]

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত :

আশূরার ছিয়াম বড় ফযীলতপূর্ণ। কেননা হাদীছে এসেছে—

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ ইয়াযীদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে আশূরার দিনে ছওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ দিন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিনকে অন্য দিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিনে ছওম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রামাযান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে ছওম পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।[৫]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ 'আশূরার দিনের ছওমের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি আশাবাদী যে, তিনি এর দ্বারা আগের বছরের গুনাহ মোচন করে দিবেন'।[৬]

আশূরার ছিয়ামের সংখ্যা :

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে—

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশূরার দিন ছিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন ছাহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইয়াহূদ এবং নাছারারারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইনশা-আল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

আল্লাহ আমাদের সকলকে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আশূরায় মুহাররামে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করার তাওফীক্ব দিন এবং আশূরাকে কেন্দ্র করে বিদআত, কুসংস্কার ও জাহেলী কর্মকাণ্ড হতে হেফাযত করুন- আমীন!

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৪।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০০২।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩২।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।

আরাফার খুৎবা

অনুবাদ : শায়খ মুহাম্মাদ হযরত আলী

*[৯ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ৮ জুলাই, ২০২২। আরাফার মাঠে অবস্থিত 'মসজিদে নামিরাহ' আরাফার খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আব্দুল করীম আল-ঈসা** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক **শায়খ মুহাম্মাদ হযরত আলী**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

সমস্ত প্রশংসা সর্বজ্ঞানী, সবজান্তা আল্লাহর জন্য, তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তিনিই আল্লাহ আসমানে এবং যমীনে, তিনি তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য বিষয় জানেন, তিনি জানেন যা তোমরা উপার্জন কর। তাঁর কাছেই আছে গায়েবের চাবিকাঠি; যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। তিনি জানেন যা আছে স্থলভাগে ও জলভাগে, এমন কোনো বৃক্ষপত্র পতিত হয় না, যা তিনি জানেন না। যমীনের অন্ধকারে কোনো শষ্যদানা, সজীব বা নির্জীব যে কোনো বস্তু; সব কিছু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই, তিনি গোপন ও অতিগোপন বিষয়ও জানেন; আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই। জ্ঞানগতভাবে তিনি প্রতিটি জিনিসকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁর বিবরণ দিয়েছেন এভাবে যে, 'আর তিনি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আর আপনার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহ রয়েছে'। তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর এবং তাঁর সমস্ত ছাহাবীদের উপর আল্লাহর দরূদ ও প্রভূত সালাম বর্ষিত হোক।

অতঃপর, হে বায়তুল্লাহর হাজীগণ! প্রতিটি জায়গায় অবস্থিত হে মুসলিমগণ, আপনারা মহান আল্লাহকে ভয় করুন, তবে আপনারা সফলতা, নাজাত ও দুনিয়া-আখেরাতে সুখ পাবেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যদি তারা ঈমান আনয়ন করত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তবে তারা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করত, যদি তারা বুঝত' *(আল-বাক্বারা, ২/১০৩)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে আছেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৪)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩১)*।

আমরা কীভাবে আল্লাহকে ভয় করব না এবং একত্ববাদের সাথে তাঁর ইবাদত করব না, অথচ তিনি কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ আপনাকে কোনো ক্ষতি দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনার মঙ্গল করতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহকে প্রতিরোধকারী কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার কাছে তিনি সেটা পৌঁছান। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিদয়ালু' *(ইউনূস, ১০/১০৭)*। তিনি তাক্বওয়া ও ইলম শিক্ষার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর তিনি তোমাদের ইলম দান করবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত' *(আল-বাক্বারা, ২/২৮২)*। তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো তিনি আমাদেরকে যে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন, তার সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া এভাবে যে, ইবাদতকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা এবং এর কোনো কিছুকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছেই সমর্পণ না করা, সে যে-ই হোক না কেন!

হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানাস্বরূপ এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য জীবিকাস্বরূপ ফলমূল উৎপন্ন করেন। কাজেই তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করো না। এটাই ছিল সমস্ত নাবীদের দাওয়াত। যেমন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতীকে বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো, তাঁকে ভয় করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝ' *(আল-আনকাবূত, ২৯/১৬)*। আল্লাহ তাআলা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, নাবী-রাসূলগণকে তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষক ও তাওহীদের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাওহীদ হলো এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। প্রত্যেক নাবী তাঁর জাতিকে বলেছেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো সত্যিকার মা'বূদ নেই। তোমরা কি ভয় করবে না?' *(আল-আ'রাফ ৭/৬৫)*। কাজেই এটি স্থিরকৃত বিষয় যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক জানার এই তাওহীদ, এটাই হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ। 'আর আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দুই ইলাহা গ্রহণ করো না, নিশ্চয়ই সত্য ইলাহ একজনই। অতএব তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে যা কিছু আছে, সবই তাঁর জন্য। আর তাঁর

জন্যই রয়েছে একনিষ্ঠ শাশ্বত আনুগত্য। তারপরও তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে?' তোমাদের কাছে যেসব নেয়ামত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, তারপর তোমাদের যখন দুঃখ স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁর কাছে রোনাজারি করো। অতঃপর যখন তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করে দেন, তখনই তোমাদের মধ্যে একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শিরক স্থাপন করে। ফলে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা তারা অস্বীকার করে। তবে তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে' *(আন নাহল, ১৬/৫১-৫৫)*।

কাজেই আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেওয়া এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় এবং পরকালে নাজাতের কারণ। মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার অন্যতম অর্থ হলো তিনি যে বার্তা দিয়েছেন, তা সত্যায়ন করা, তাঁর নির্দেশসমূহ মেনে চলা এবং তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তদনুযায়ী আমল করা। যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে নাবী! নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সাক্ষী, শুভসংবাদদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী, আল্লাহর দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী এবং আলোক উজ্জ্বল প্রদীপরূপে পাঠিয়েছি' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪৫-৪৬)*।

এই দুই শাহাদাহ ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে প্রথম রুকন। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হলো (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, (২) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং (৫) বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা, যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে'।[১] হে হাজীবৃন্দ! আল্লাহ তাআলা এই ফরয পালন করা সহজ করে দিয়ে আপনাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই এটি পালনে আপনারা নবী ﷺ-এর হজ্জের অনুসরণ করুন। তিনি বলেছেন, 'যাতে তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়মকানুন গ্রহণ করতে পার'।[২] আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট কতিপয় মাসসমূহে। অনন্তর যে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী মিলন, পাপাচারিতা এবং কলহ-বিবাদ না করে। আর তোমরা যা কিছু ভালো কর, তা তিনি জানেন। আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করবে। তবে তাক্বওয়ার পাথেয় সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব, হে জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আমাকে ভয় করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৭)*।

হে বায়তুল্লাহর হাজীগণ! প্রতিটি জায়গায় অবস্থিত হে মুসলিমগণ! আমি আপনাদেরকে এবং নিজেকে তাক্বওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটি শ্রেষ্ঠ পাথেয়। অনুরূপভাবে আমি আপনাদেরকে এবং নিজেকে তাক্বওয়ার উপদেশ দিচ্ছি সৎকাজে প্রতিযোগিতা করার। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দ্রুত ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও এমন জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীন বরাবর। এটি মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩)*। হে আল্লাহর বান্দাগণ! ভালো কাজে ধাবিত হওয়ার অন্যতম অর্থ হলো সেসব ইসলামী মূল্যবোধ ধারণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া, যা মুসলিমের সকল আচার-আচরণকে শালীন ও মার্জিত করে তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে। মহান রবের ঘোষণা অনুযায়ী এসবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমার কাছে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় এবং ক্বিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হবে'।[৩]

অজ্ঞতা-মূর্খতার মোকাবেলা করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, 'আপনি ক্ষমার নীতি গ্রহণ করুন। ভালো কাজের নির্দেশ দান করুন। আর জাহেলদের এড়িয়ে চলুন' *(আল-আ'রাফ ৭/১৯৯)*।

হে বায়তুল্লাহর হাজীগণ! হে মুসলিম সম্প্রদায়! ইসলাম প্রতিপালনের অন্তর্ভুক্ত হলো এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকা, যা তাদের মাঝে পারস্পরিক ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং যা কিছু আমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বিনষ্ট করে, তা থেকে দূরে থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মযবূতভাবে ধারণ করো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মানুষের মাঝে সর্বোত্তম হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার সাধন করেন'।[৪] ইসলাম সকলের কল্যাণকে ভালোবাসে এবং তাদের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করতে চায়। এসব মহান মুল্যবোধ ও আদর্শের কারণেই ইসলামের আলো প্রসারিত হয়েছে। এই কল্যাণের তাবলীগ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে সচেষ্ট থেকেছেন কিছু মানুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন। অনুরূপভাবে এই কাজে গভীর ইলমের অধিকারী আলেমদের বরকতময় অবদান রয়েছে। তারা সকল বিষয়ে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দান করেছেন, ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার মুলোৎপাটনে নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

বায়তুল্লাহর হাজীগণ! দু'আ কবুলের স্থানসমূহের মাঝে আরাফায় আপনাদের এই অবস্থান অন্যতম একটি স্থান।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬০২২।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/৩০২৮।
৩. তিরমিযী, হা/২০১৮।
৪. ছহীহুল জামে', হা/৩২৮৯।

রাসূল ﷺ আরাফায় অবস্থান করেছেন, আরাফায় খুৎবা দিয়ে এক আযান ও দুই ইক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত একত্রিত করে ক্বছর করে আদায় করার পর আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন, তাঁর যিকির করেছেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান অব্যাহত রেখেছেন। অতঃপর ধীরে-সুস্থে পথ চলে মুযদালিফায় গিয়েছেন এবং ছাহাবীদেরকেও শান্ত ও ধীরস্থিরতার সাথে পথ চলতে আদেশ করেছেন। মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক'আত ছালাত এবং এশার দুই রাক'আত ছালাত আদায়া করেছেন। এখানে রাত্রি যাপন করেছেন। এখানে ফজরের ছালাত আদায় করে যিকিরের জন্য বসেছেন এবং প্রভাত স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত যিকির করেছেন। তারপর মিনায় গিয়েছেন, অতঃপর জামরায়ে আকাবায় (বড় জামরায়) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। তারপর কুরবানীর পশু যবেহ করেছেন। এবং মাথা মুণ্ডন করে প্রাথমিক হালাল হয়ে গিয়েছেনে। তারপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ করে পুনরায় মিনায় ফিরে এসেছেন এবং আইয়ামে তাশরীকের রাতগুলোতে এখানে রাত্রি যাপন করেছেন। মিনায় রাসূল ﷺ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করতেন এবং প্রত্যেহ জামরাগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন; প্রথমে ছোট জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন, তারপর মধ্য জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। এরপর আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। তারপর জামরায়ে আকাবায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। তিনি মা'যূর ব্যক্তিকে মিনায় রাত্রি যাপন করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তিনি ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছেন। তবে ১২ যিলহজ্জে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর মক্কা থেকে যাত্রা করার পূর্বে তিনি বিদায়ী তাওয়াফ করেছেন।

অতএব, হে মুসলিমবৃন্দ! আপনারা মহান এই সুযোগ কাজে লাগান। আরাফার দিন, যাতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের পূর্ণতা দান করলাম, আর দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনিত করলাম' *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আরাফার দিনের চেয়ে এমন কোনো দিন নেই, যাতে আল্লাহ অধিক পরিমাণ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। এ সময় আল্লাহ নিকটবর্তী হোন তারপর তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন'।[৫] কাজেই বেশি বেশি দু'আ করুন। কেননা আল্লাহ তাআলা আপনাদের দু'আ কবুল করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব' *(গাফির, ৪০/৬০)*। তিনি আরো বলেছেন, 'আর যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (তবে বলুন যে,) নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আহ্বান করে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*।

হে আল্লাহ! হাজীদের হজ্জের কার্যাবলিকে কবুল করুন। তাঁদের দু'আ কবুল করুন। তাঁদের কার্যাবলি সহজ করে দিন। তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিন। তাদেরকে তাদের দেশে নিরাপদে ফিরিয়ে দিন এমন অবস্থায় যে তারা ছওয়াব সঞ্চয় করেছেন, তাদের সম্মান-মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। তাদের মাঝে কেউ কেউ বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দিন' *(আল-বাক্বারা, ২/২০১)*। হে আল্লাহ! মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দিন। তাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিন। তাদের মাঝে কল্যাণ ও ইলমের বিস্তার ঘটান। তাদের সন্তানদের সংশোধন করুন। তাদের রিযিক্বে বরকত দিন। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান। হে আল্লাহ! সম্মানিত হারামাইনের খাদেম বাদশা সালমান বিন আব্দুল আযীয এবং তার সুযোগ্য যুবরাজকে ভালো কাজের তাওফীক্ব দিন, সংশোধন করুন এবং সাহায্য করুন। তাদেরকে এবং তাদের সরকারকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ইসলাম, মুসলিম ও সমগ্র মানবতার জন্য যা তারা করেছেন এবং ভবিষ্যতে যা করবেন তার বিনিময়স্বরূপ। আর আপনি তাদের সাথে সাহায্য-সহযোগিতাকারী হিসেবে থাকুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৩১৭৯।

পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এর প্রতিটি বিধিবিধান নবী করীম ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার নিয়মও শিক্ষা দিয়েছেন।[১] এই প্রবন্ধে পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

(১) পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে শীঘ্রই সম্পন্ন করা : পেশাব-পায়খানার বেগ অনুভূত হলো শীঘ্রই তা সম্পন্ন করতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ‘খাদ্য উপস্থিত হলে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলেও ছালাত নেই’।[২]

(২) লোকচক্ষুর অন্তরালে পেশাব-পায়খানা করা : পেশাব-পায়খানা খোলা স্থানে করা হলে দূরে যেতে হবে, যাতে লোক থেকে আড়াল হয়। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ ‘নবী ﷺ যখন পায়খানায় যেতে ইচ্ছা করতেন, তখন এত দূরে চলে যেতেন, যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়’।[৩] উল্লেখ্য, চারদিকে ঘেরা স্থান হলে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

(৩) নিষিদ্ধ স্থানে পেশাব-পায়খানা করা থেকে বিরত থাকা : হাদীছে এমন কিছু স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ। সেগুলো হলো—

(ক) গোসলখানায় : আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ‘তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, এরপর আবার সেখানে গোসল করে অথবা ওযূ করে।[৪]

(খ) বদ্ধ পানিতে : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لاَ يَجْرِى ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ‘তোমাদের কেউ যেন (বহমান নয় এমন) বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে। অতঃপর এতে গোসল করে’।[৫]

(গ) বিশেষ তিনটি স্থানে : মুআয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ ‘অভিশাপের কারণ হয় এমন তিনটি স্থানে পেশাব-পায়খানা করা হতে তোমরা বেঁচে থাকবে— (১) পানির ঘাট, (২) চলাচলের পথ ও (৩) ছায়াযুক্ত স্থান’।[৬]

(৪) যমীনের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে কাপড় না খোলা : আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ ‘নবী ﷺ যখন প্রস্রাব-পায়খানায় যেতেন, তখন জমিনের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না’।[৭]

(৫) আল্লাহর নাম সম্বলিত কোনো কিছু নিয়ে শৌচাগারে প্রবেশ না করা : যেমন— আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত, হাদীছ সম্বলিত কিছু নিয়ে **শৌচাগারে** প্রবেশ করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

---

* আলিম ২য় বর্ষ, চরবাটা ইসমাঈলিয়া আলিম মাদরাসা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২; মিশকাত, হা/৩৩৬।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬০; মিশকাত, হা/১০৫৭।

৩. আবূ দাঊদ, হা/২, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৩৪৪, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘পেশাব-পায়খানার আদব’ অনুচ্ছেদ।

৪. আবূ দাঊদ, হা/২৭; তিরমিযী, হা/২১, নাসাঈ, হা/৩৬, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘গোসলখানায় প্রস্রাব করা মাকরূহ’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হা/৩৫৩, হাদীছ ছহীহ।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৩৯, ‘ওযূ’ অধ্যায়, ‘আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮২; মিশকাত, হা/৪৭৪।

৬. আবূ দাঊদ, হা/২৬, হাদীছ হাসান, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘নবী (ছা.) যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হা/৩৫৫।

৭. তিরমিযী, হা/১৪, হাদীছ ছহীহ, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘মলত্যাগের সময় গোপনীয়তা অবলম্বন করা’ অনুচ্ছেদ; আবূ দাঊদ, হা/১৪; মিশকাত, হা/৩৪৬।

‘যে আল্লাহর সম্মানিত বিধানাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল, তার রবের কাছে তার জন্য সেটাই উত্তম’ *(আল-হজ্জ, ২২/৩০)*।

(৬) অসুস্থ বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে পাত্রে পেশাব করা : অসুস্থ বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে পাত্রে পেশাব করা যায়। উমায়মা বিনতু রুক্বায়ক্বাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ‘নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খাটের নিচে একটি কাঠের গামলা ছিল। তিনি রাতে এতে প্রস্রাব করতেন’।[৮]

(৭) টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দু‘আ পড়া : শৌচাগারে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দু‘আ পড়া সুন্নাত। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ ‘যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে, তখন জিন শয়তানের চোখ আর বনী আদমের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হলো ‘বিসমিল্লাহ’ বলা’।[৯] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পায়খানায় গেলে বলতেন, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবায়েছ’। অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নর ও নারী শয়তানদের (ক্ষতি সাধন) থেকে আশ্রয় চাচ্ছি’।[১০] আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন টয়লেট হতে বের হতেন তখন বলতেন, ‘গুফরানাকা’। অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি’।[১১]

(৮) টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখা : টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখা উত্তম।[১২]

(৯) পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় যিকির ও তাসবীহ না করা : পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় যিকির ও তাসবীহ পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। মুহাজির ইবনু কুনফুয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ ‘তিনি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলেন। তিনি তখন প্রস্রাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি ওযূ না করা পর্যন্ত সালামের কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর তিনি ওযর পেশ করে বললেন, পবিত্রতা ছাড়া আমি আল্লাহর নাম নেওয়া অপছন্দ করি’।[১৩]

(১০) ক্বিবলার দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা না করা : আবূ আইয়ূব আল-আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا ‘তোমরা যখন পায়খানায় যাবে, তখন ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না...’।[১৪]

(১১) পেশাব-পায়খানার সময় কথা না বলা : আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَانِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ‘দুই ব্যক্তি এক সঙ্গে যেন পায়খানায় এমনভাবে না বসে যে, দু’জনেই দু’জনার লজ্জাস্থান দেখতে পায় এবং পরস্পরের সাথে কথা বলে। কেননা মহান আল্লাহ এ ধরনের কাজে খুবই রাগান্বিত হন’।[১৫]

---

৮. আবূ দাঊদ, হা/২৪, ‘হাসান ছহীহ’; নাসাঈ, হা/৩২, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘পাত্রে প্রস্রাব করা’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হা/৩৬২।

৯. তিরমিযী, হা/৬০৬, হাদীছ ছহীহ, ‘জুমআ’ অধ্যায়, ‘পায়খানায় যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হা/৩৫৮।

১০. ছহীহ বুখারী ১৪২, ‘ওযূ’ অধ্যায়, ‘পায়খানায় যাওয়ার সময় যা বলতে হয়’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৫; মিশকাত, হা/৩৩৭।

১১. তিরমিযী, হা/৭, হাদীছ ছহীহ, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘পায়খানা হতে বের হবার পর যা বলবে’ অনুচ্ছেদ; আবূ দাঊদ, হা/৩০; ইবনু মাজাহ, ৩০০; মিশকাত, হা/৩৫৯।

১২. ফিকহুস সুন্নাহ, ১/২৯।

১৩. আবূ দাঊদ, হা/১৭; মিশকাত, হা/৪৬৭।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪; মিশকাত, হা/৩৩৪, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘পেশাব-পায়খানার আদব’ অনুচ্ছেদ।

১৫. আবূ দাঊদ, হা/১৫, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘পেশাব-পায়খানায় সময় কথা বলা মাকরূহ’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হা/৩৫৬, হাদীছ ছহীহ।

(১২) বসে পেশাব করা : কোনো ওযর না থাকলে বসেই পেশাব করতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا 'যে ব্যক্তি বলে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি সব সময়ই বসে প্রস্রাব করতেন'।[১৬]

(১৩) পেশাবের ছিটা থেকে সাবধান থাকা : পেশাব করার সময় পেশাবের ছিটা থেকে সাবধান থাকতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ 'তোমরা পেশাবের ছিটা হতে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো। কেননা, সাধারণত কবরের আযাব এই কারণেই হয়ে থাকে'।[১৭]

(১৪) বাম হাত দিয়ে শৌচকার্য সম্পন্ন করা : বিশেষ কোনো ওযর ব্যতিরেকে বাম হাত দিয়েই শৌচকার্য সম্পন্ন করতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى 'নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ডান হাত ছিল তাঁর পবিত্রতা অর্জন ও খাবারের জন্য। আর বাম হাত ছিল প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে এমন কাজের পবিত্রতার জন্য'।[১৮]

(১৫) শৌচকার্যের সময় পবিত্র পানি ব্যবহার করা : শৌচকার্যের সময় পবিত্র পানি ব্যবহার করতে হবে।

(১৬) বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা : ঢিলা দিয়ে ইস্তেনজা করার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ 'কোনো ব্যক্তি ওযূ করার সময় যেন ভালো করে নাক ঝেড়ে নেয় এবং ইস্তেনজা করার সময় বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে'।[১৯] এক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে হবে।[২০]

(১৭) কুলুপের ক্ষেত্রে হাড্ডি ও হাড় ব্যবহার না করা : ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ 'তোমরা শুকনো গোবর ও হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করো না। কেননা এসব তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক'।[২১]

(১৮) পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর হাত ধৌত করা : পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর হাত ধৌত করা সুন্নাত। এক্ষেত্রে মাটি বা সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ 'নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পায়খানায় গেলে আমি তাঁর পেছনে পেছনে কখনো 'তাওর'-এ করে আবার কখনো 'রাকওয়া'-এ করে পানি নিয়ে যেতাম। এ পানি দ্বারা তিনি শৌচকর্ম সম্পাদন করতেন। এরপর তিনি মাটিতে স্বীয় হাত ঘষতেন। অতঃপর আমি আর এক পাত্রে পানি আনতাম। এ পানি দিয়ে তিনি ওযূ করতেন।[২২]

আমরা যেন পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচারসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারি, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৬. তিরমিযী, হা/১২, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, হা/২৯; মিশকাত, হা/৩৬৫, হাদীছ ছহীহ।

১৭. বুলূগুল মারাম, হা/১০২; দারাকুত্বনী, হা/৪৭৪, হাদীছ ছহীহ।

১৮. আবূ দাঊদ, হা/৩৩, হাদীছ ছহীহ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ইস্তেনজা করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা মাকরূহ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হা/৩৪৮।

১৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৭; মিশকাত, হা/৩৪১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।

২০. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২; মিশকাত, হা/৩৩৬।

২১. তিরমিযী, হা/১৮, হাদীছ ছহীহ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'যেসব বস্তু দিয়ে ইস্তেনজা করা মাকরূহ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত, হা/৩৫০।

২২. আবূ দাঊদ, হা/৪৫, হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/৩৬০, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।

বাংলাদেশে বন্যার্তদের বেহাল দশা ও ইউরোপে বর্ণবাদের ভয়াবহ চিত্র

-জুয়েল রানা*

১.

দেশের অনেক ভাটি অঞ্চল যখন পুড়ছে তীব্র দাবদাহে, তখন সিলেট ভাসছে পানিতে। সেখানে বিরাজ করছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। এর আগে গত এপ্রিলে বন্যায় তলিয়ে যায় সিলেটসহ আশপাশের হাওর এলাকার ফসল। এর মাস খানেক না যেতেই সিলেটে আবারও দেখা দিয়েছে বন্যা।

এবার বন্যা এসেছে আরও ভয়ংকর রূপে। তলিয়ে গেছে প্রায় পুরো সিলেট। সুনামগঞ্জেরও বেশিরভাগ এলাকা জলমগ্ন। সংশ্লিষ্টরা জানান, সিলেটে প্রধান নদীগুলো বিশেষত সুরমা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, নগর ও এর আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জলাশয় ভরাট, দখল হওয়া এবং সিলেটের উজানে মেঘালয়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণেই এই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। **সুনামগঞ্জের বাসিন্দারা বলছেন, বহু বছরের মধ্যে তারা এত মারাত্মক বন্যার মুখোমুখি হননি।** সবমিলিয়ে ৩৫ লাখের বেশি মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বলে কর্তৃপক্ষ বলেছে।

চারদিকে অথৈ পানি। কোথাও লাশ দাফন করার শুকনো জায়গাটুকুও নেই। বাধ্য হয়ে মায়ের লাশ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছেন এক ছেলে। কিন্তু দাফন তো হতে হবে মায়ের। তাই লাশের সঙ্গে তিনি চিরকুট লিখে দেন। তাতে লেখা— **'শুকনো জায়গায় মাকে কবর দিয়ো'**। ভেলায় লাশ ভাসিয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরা নীরবে চোখের জল ফেলেন। তাদের আশা, কোনো সহৃদয় ব্যক্তি লাশ পাওয়ার পর দাফনের ব্যবস্থা করবেন। বন্যাদুর্গত সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের টাঙ্গুয়ার হাওর এলাকায়ও এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। 'নয় নগর' গ্রামের রেণু মিয়ার দুই বছরের ছেলে বন্যার পানিতে ডুবে মারা যায়। শুকনো জায়গায় কবর দিতে না পেরে মা-বাবা পানিতে ছেলের লাশ ভাসিয়ে দেন। গর্ভবতী স্ত্রীকে সিলেটের এক গ্রাম থেকে শহরে নেওয়ার জন্য নৌকা মালিককে ৪০ হাজার টাকা দিতে চাইলেও নৌকার মাঝি ৫০ হাজার টাকার নিচে যায়নি।

করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বন্যার বড় ধাক্কা লেগেছে পাবলিক পরীক্ষাসহ গোটা শিক্ষাব্যবস্থায়। বন্যা পরিস্থিতির কারণে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। আর এসএসসি পেছানোর কারণে পেছাতে হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাও। সেই সাথে স্থগিত করা হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলমান বি.এড পরীক্ষাও।

এবারের বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সিলেট অঞ্চল। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এই অঞ্চল থেকে ৯৩০টি স্কুলের ১ লাখ ১৬ হাজার ৪২৭ জন শিক্ষার্থীর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা। অনেক স্কুলে পানি উঠেছে। আর মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ১২২ বছরের মধ্যে এবার রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেই পানি নেমে বাংলাদেশের সিলেট-সুনামগঞ্জে প্রবেশ করছে। কথা ছিল, পানি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নেমে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো— বাংলাদেশের নদীগুলোর তো নাব্যতা নেই। ফলে নদী উপচে সৃষ্টি হয়েছে বন্যা।

ভারত থেকে প্রবাহিত ৫৪টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। হিমালয় অববাহিকায় ভারতের যেসব রাজ্য রয়েছে, এ রাজ্যগুলোতে বর্ষা মৌসুমে ভারী বর্ষণ হলে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোতে পানির প্রবাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উভয় দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর উপর ভারত একতরফা বেশ কয়েকটি বড় বাঁধ নির্মাণের কারণে বেশির ভাগ নদীর বাংলাদেশ অংশে পলি জমে এর নাব্য হ্রাস পেয়ে নদীগুলো পানি ধারণক্ষমতা মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়েছে। উজানে বাঁধ নির্মাণ পরবর্তী শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন অনুযায়ী পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়, অপর দিকে বর্ষা মৌসুমে বাঁধের উপরের দিকে পানির চাপের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটলে ভারত বাঁধের সবগুলো গেট খুলে দেয়। এতে মাত্রাতিরিক্ত পানির প্রবাহের কারণে নদীর দু'কূল উপচে ফসলের ক্ষেত, গ্রাম, জনপদ, রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় সামুদ্রিক ঝড় থেকে সৃষ্ট জোয়ারে দেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলো প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। আবার অমাবস্যার সময় জোয়ারের পানির বৃদ্ধি ঘটলে বন্যা দেখা দেয়।

প্রতি বছরই বাংলাদেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা হয়; তবে স্বাধীনতা-পরবর্তী ব্যাপক বিধ্বংসী বন্যার কারণে পুরো দেশের বেশির ভাগ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

বন্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৮ সালের সংগঠিত বন্যা। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ১৯৮৫, ১৯৯১, ২০০৭ ও ২০০৯ সালে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়ে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২.

ফিলিস্তীনিদের বিরুদ্ধে ইসরাঈলের কর্মকাণ্ডকে ‘বর্ণবাদী অপরাধ’ হিসেবে অভিহিত করে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে স্পেনের কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক পার্লামেন্টে। ইউরোপের প্রথম কোনো পার্লামেন্টে ইসরাঈলবিরোধী এমন প্রস্তাব পাশ হলো। লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই এ তথ্য জানায়। ওই প্রস্তাবে ইসরাঈলকে এমন এক নীতি প্রয়োগের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে যা ‘আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধি, ধারা ৭.২ (এইচ) অনুসারে বর্ণবাদের অপরাধের সমতুল্য’। এ প্রস্তাব পাশের পর এন কমু পোডেম পার্টি জানায়, ‘পার্লামেন্ট, প্রথম ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান যা স্বীকৃতি দিয়েছে, ইসরাঈল ফিলিস্তীনিদের ওপর বর্ণবাদী অপরাধ করছে’। এমপি সুসানা সেগোভিয়া সানচেজ বলেন, এটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় সরকারগুলো গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও নিজ শ্বেতাঙ্গ জনগণের জন্য মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পারলেও বর্ণবাদ ও বহিরাগতদের প্রতি ঘৃণার বিষয়টির সুরাহা এখনো করতে পারেনি। বরং দিন দিন তা বেড়েই চলছে। আমেরিকায় শুধু গায়ের রং কালো বা তামাটে হওয়ায় প্রতি বছর বহু মানুষ হত্যার শিকার হয়। একইভাবে ইউরোপে কেবল গায়ের রং ও বিদেশী হওয়ায় ঘৃণার শিকার হয় অসংখ্য মানুষ। সেসব খবর খুব কমই জানে বাকি বিশ্বের জনগণ। আর এ ধরনের মানসিকতা থেকেই আমেরিকা ও ইউরোপজুড়ে উত্থান ঘটেছে শ্বেতাঙ্গ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্লোগান।

অদ্ভুত এক দ্বৈতসত্তায় দ্বিখণ্ডিত শ্বেতাঙ্গ বিশ্ব। যেখানে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইরাকের শরণার্থীদের জন্য দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যেখানে এসব দেশের মানুষদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে। যখন আমরা টিভি ফুটেজে দেখতে পাই পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির সীমান্ত থেকে এসব অসহায় মানুষকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তখন ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের প্রতি ইউরোপের এমন ভালোবাসা বর্ণবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কী হতে পারে?

‘জীবন যদি হতো তাদের মতো!’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

মনে আছে কি আপনার, মদ হারাম হওয়ার হাদীছটি? ছাহাবীদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল? যে মদ ছিল তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী; একবেলা অনাহারে কাটানো সম্ভব ছিল; কিন্তু মদছাড়া জীবন ছিল অন্তঃসারশূন্য। মদের জন্য একজন অপরজনকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না; কুণ্ঠাবোধ করত না কারো উপর যুলুম-নির্যাতন করতে। অপরাহ্নে ছায়াদার বৃক্ষের নিচে মৃদুমন্দ বাতাসে মদপান করার প্রবণতা তাদের মাঝে ছিল। কত আনন্দই না পেত শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে। এই আনন্দ, এই ফুর্তি নিমিষেই এক ঘোষণাতে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘যেদিন মদপান হারাম করা হয়, সেদিন মদীনার অলিগলিতে, ঘরের আঙিনায় সুবিস্তৃত মাঠে-প্রান্তরে নদীর স্রোতের ন্যায় মদের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। যাদের থলিতে, পাত্রে, মটকায় মদ ছিল, তারা সাথে সাথে তা ফেলে দেয়; এমনকি যারা মুখে পুরেছিল ও গিলে ফেলেছিল, তারাও মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দেয়।

সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ! তাদের মতো হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। তাদের হৃদয় ছিল কত নির্মল ও স্বচ্ছ, ছিল না কোনো প্রকার কলুষতা। সুন্দর সোনালী ছিল তাদের কাজকর্ম। শরীর ছিল জীর্ণশীর্ণ, কিন্তু ঈমানী মন ছিল তেজস্বী। কাপড় ছিল সংকীর্ণ; কিন্তু মনটা ছিল অথৈ সাগরের চেয়েও বিশাল। তাদের মতো তেজস্বী ঈমান আমাদেরও দাও, হে দয়াময়! চলুন না, বদলে যাই ও বদলে দেই। বেলা ফুরাবার আগেই, পশ্চিম দিগন্ত থেকে ঘুটঘুটে অন্ধকার আবর্তিত হওয়ার আগেই আপন নীড়ে আপন গৃহে ফিরে যাই; নচেৎ ঘোর অন্ধকার ও আমাদের চিরশত্রুর প্রবঞ্চনায় গন্তব্যে ফেরা মুশকিল হয়ে যাবে। সময় থাকতেই গোছগাছ করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। গাফিলতির মাঝে থাকলে ঘাপটি মেরে বসে থাকা শয়তানের দলবল পুণ্য নামক পুঁজি লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। তাই আর কালবিলম্ব না করে এখনই রওনা দাও চিরসুখের আবাস জান্নাতের পানে, রওনা দাও ছায়াময় সবুজ অরণ্যের দিকে। যেখানে নেই সূর্যের প্রখর তাপ, নেই কোনো ক্লান্তি-কষ্ট-ক্লেশ; আছে শুধু বিরামহীন আরাম-আয়েশ। চারদিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবে অনিন্দ্য সুন্দরী হূররা; যাদের দেখামাত্রই নয়ন জুড়িয়ে যাবে, যাদের একঝলক মুচকি হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠবে পরিবেশ। পায়ের তলদেশ দিয়ে শোনা যাবে প্রবহমান নহরের কলকল শব্দ। থাকবে না কোনো হট্টগোল ও কোলাহল, চারপাশ নীরব-নিস্তব্ধ। কতই না সৌভাগ্যবান তারা, যারা এই স্থানের অধিকারী হবে! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

দাড়িবিহীন মুসলিম!

-মুরতযা বিন আযহার*

দুনিয়াজুড়ে দাড়িবিহীন মুসলিমের অভাব নেই। তাদেরই সংখ্যাধিক্য। যারা ছালাত পড়ে না, তাদের তো দাড়ি নেইই, দাড়ি থাকার কথাও নয়। কেননা তারা তো ইসলামের মূল রুকনই মানে না! কিন্তু যারা ছালাত পড়ে, তাদেরও অনেকেরই দাড়ি নেই। এর কারণ হিসেবে যেটা মনে হয়েছে— ছোটবেলায় জালসা এবং খুৎবাতে শুনতাম দাড়ি রাখা সুন্নত। সেই প্রভাব এখনো কাটেনি। গ্রামে-গঞ্জে এখনো অনেকে মনে করেন মুসলিমদের দাড়ি রাখার বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা যে এক শ্রেণির আলেমের গাফিলতি, তাতে সন্দেহ নেই। দাড়ি রাখা যে ওয়াজিব— এ বিষয়টি তারা কেন এখনো গোপন রাখছেন, বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর!

গ্রামে-গঞ্জে শয়ে শয়ে খত্বীবের পেছনের কাতারে হাজার হাজার মুছল্লী ৩০/৩৫ বছর ধরে ছালাত আদায় করছে। যুবক থেকে বুড়ো হতে চলল, তবু তারা দাড়ি চেঁছেই যাচ্ছে। এরাই মোড়ল, গ্রামের সরদার, গ্রামের মাথা! ইমাম সাহেব না এদের ব্যক্তিগতভাবে বললেন, না আমভাবে খুৎবাতে এ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য দিলেন!

এই ধরনের মুসলিমরা কেন দাড়ি রাখে না, এ বিষয়ে আরও কিছুটা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এক ডজনেরও বেশি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের দাড়ি না রাখার বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছি। শুধু একজন ছাড়া অন্যরা এ বিষয়ে নিরুত্তর থেকেছে। দু-একজন দাড়ি রাখলে গাল চুলকায় একথা বলেছে। এর উত্তরে বলি, প্রথম প্রথম এমনটা হয়, তারপর ঠিক হয়ে যায়। একজনের কথায় পরে আসছি। অন্যরা দাড়ি না রাখার বিষয়টি দুঃখজনকভাবে নিয়েছে। দাড়ি রাখা উচিত বলে মত পোষণ করেছে। একজন, দাড়ি রাখার বিষয়টি কুরআনে উল্লেখ নেই, বলেছে। কথাটিতে ভীষণ অজ্ঞতা জড়িয়ে আছে সন্দেহ নেই। দ্বীনের সব কথা কুরআনে থাকবে কী করে? কুরআন ও হাদীছ মিলিয়েই তো শরীআত। কুরআন ও হাদীছ দুটোই অহী এবং এই উভয় প্রকার অহী মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে মানুষদের।

দাড়ি রাখার শারীরিক উপকারিতার শেষ নেই। এখানে মাত্র তিনটি বৈজ্ঞানিক উপকারের কথা বলব।

(১) লন্ডন ইউনিভার্সিটির এক গবেষক (রবার্টস) রাস্তা থেকে ১০০ জনের দাড়ির স্যাম্পল সংগ্রহ করেন। গবেষণাগারে কিছু ব্যাকটেরিয়া এই দাড়িগুলোতে ছেড়ে দিয়ে দেখেন, দাড়ির সংস্পর্শে ব্যাকটেরিয়াগুলো বেঁচে থাকতে পারছে না।

(২) আরেক গবেষণা থেকে জানা যায়, যারা দাড়ি ছেড়ে দেয়, তাদের দাড়ি 25-40% UV Ultra violet ray থেকে ত্বককে রক্ষা করে স্কিন ক্যান্সার হতে বাধা দেয়। ডার্মাটোলজিস্ট ড. অ্যাডাম ফ্রাইডম্যান বলেন, মুখের ত্বক দাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকার ফলে সূর্যের আলোর মারাত্মক ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। এতে ত্বকের ক্ষতি কম হয়, রিংকেল পড়ে অনেক দেরিতে। সুতরাং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেরি হয়।

(৩) যারা দাড়ি কাটে তাদের ত্বক শক্ত হয়। ব্যাকটেরিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। যে রেজার দিয়ে দাড়ি কাটা হয়, তাতে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে এবং উন্মুক্ত খোলা ত্বকে ব্যাক্টেরিয়ার গ্রোথ হয়। ফলে যারা দাড়ি কাটেন তাদের মুখে ইনফেকশন হয়।

যাহোক, গ্রাম-শহরের অধিকাংশ ছালাত আদায়কারী মানুষ প্রায় বুড়ো হতে চলল, অনেকেই এখনও দাড়ি রাখেন না কেন?

এর জন্য যে কারণগুলো দায়ী মনে হয়েছে—

(১) অধিকাংশ মসজিদে জুমআর খুৎবায় এ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য দেওয়া হয় না। অধিকাংশ আলেম বিষয়টির ওপর তেমন গুরুত্ব দেন না।

(২) অধিকাংশ মুসলিম এখনো মনে করে, দাড়ি রাখা সুন্নাত! তারা মনে করে, সুন্নাত পালন করলে নেকী, আর না পালন করলে কোনো গুনাহ নেই।

(৩) দাড়ি রাখলে মুখের চেহারাটাই পাল্টে যাবে! চেহারার ইয়ং ভাবটা আর থাকবে না! স্মার্টনেস চলে যাবে।

(৪) অনেকের দাড়ি, মোচ অল্প বয়সেই সাদা হয়ে গেছে, তাই দাড়ি একটুও বড় হতে দেন না। তাদের ধারণা, দাড়ি রাখলেই তিনি সমাজে দাদু বনে যাবেন।

* মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

(৫) অনেকের স্ত্রী এ বিষয়ে ভীষণ বাধ সাধেন। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখতে অনেকে দাড়ি চাঁছেন। এমন বহু প্রমাণ আছে।

(৬) অনেকে ভাবেন, এই বয়সে আবার দাড়ি কীসের? দাড়ি বুড়ো বয়সেই ছাড়তে হয়।

(৭) কারো কারো ভাবনা, দাড়ি রাখলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিরূপ চোখে দেখে, চাকরিবাকরি বা ব্যবসাসূত্রে বিভিন্নজনের সঙ্গে মিশতে হয়, তাই দাড়ি রাখলে সমাজে চলতে অসুবিধা হয়।

(৮) অনেক যুবক দাড়ি রাখতে দ্বিধা করেন, দাড়ি রাখলে অনেক মেয়ে তাকে পছন্দ করবে না।

মোটামুটি এই কারণগুলোই অধিকাংশ ছালাত আদায়কারী মুসলিমের দাড়ি না রাখার কারণ বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। এই কারণগুলো সবই দুনিয়াবী। এর জন্য দায়ী তাদের ঈমানী দুর্বলতা।

'দাড়ি রাখলে স্মার্টনেস থাকবে না'— আপনি যদি ত্বাগূতের অনুসারী না হন, শয়তান যদি আপনাকে রিমোর্ট না করে, তাহলে দাড়িতেই আপনি প্রকৃত স্মার্ট। স্রষ্টা প্রদত্ত প্রকৃতিগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিকৃতি না ঘটিয়েই আপনি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সৃষ্টির সেরা! দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিন দেখবেন, আপনিই প্রকৃত স্মার্ট। একমাত্র বিকৃতমনা এবং দোদুল্যমানরাই দাড়িতে নিজেকে আনস্মার্ট ভাবে।

আর যে মেয়ে আপনাকে দাড়িওয়ালা ভেবে অপছন্দ করবে, সে তো আপনার যোগ্যই নয়। দাড়ির জন্য আপনি তো এক মহা ফিতনার বিপদ থেকেই বেঁচে গেলেন। সমস্ত শয়তান নারী আপনা থেকে দূরে চলে যাবে! এ তো আপনার সৌভাগ্য! এতে আপনার ইহকালীন ও পরকালীন মহাকল্যাণ নিশ্চিত হলো।

আর দাড়ি সাদার জন্য চিন্তা কীসের? কিয়ামতের দিন সেগুলো তো সব আপনার জন্য জ্যোতিস্বরূপ। তাছাড়া আপনাকে এগুলো তো কালো রং ব্যতীত অন্য রঙে রঞ্জিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে! দেখুন না একবার রং করে, কীভাবে চকচক করে আপনার চেহারা!

আর স্ত্রীকে নয়; আল্লাহকে সন্তুষ্ট করুন। হিকমতের সঙ্গে স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করুন। স্ত্রীর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর সাহায্য চান। ইনশাআল্লাহ সে বুঝবে।

কে কোন বয়সে মারা যাবে, কেউ জানে না। আপনি বুড়ো বয়স পাবেন তার গ্যারান্টি কোথায়? তাই আর অপেক্ষা নয়। 'আজ কা কাম কাল পার না ডাল,' 'ডু ইট নাও'— এখনই! এখনই দাড়ি রাখুন।

বিশ্বের লাখ লাখ দাড়িওয়ালা মানুষ কীভাবে সমাজে চলছে, তাদের দেখে শিখুন। পাঞ্জাবের শিখদের দেখে শিখুন, তাদের সবারই দাড়ি আছে। তারা সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে চলে। তাদের তো অসুবিধা হয় না! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। শুধু মুসলিমরাই নয়; যুগে যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগুণীদের বেশিরভাগেরই দাড়ি ছিল। অ্যারিস্টোটল, প্লেটো, সক্রেটিস, পিথাগোরাস, টলেমি, জর্জ বার্নাড শ, চার্লস ডিকেন্স, আর্নেস্ট মিলার, টমাস হার্ডি, রবার্ট ব্রাউনিং, গ্যা লিলিও, চার্লস ডারউইন, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আবরাহাম লিংকন, লেলিন, গুরু নানক, ওমর খৈয়াম, কবি হাফিজ, রুমি, শেখ সাদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও কত উল্লেখ করা যায়। এদের প্রত্যেকেরই দাড়ি ছিল।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের জন্য দাড়ির প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই তিনি উপযুক্ত জায়গায় তা দিয়েছেন। সৃষ্টির সৌন্দর্যকে পরিবর্তন করার অধিকার কে আপনাকে দিল? তিনি তো আপনাকে তা পরিবর্তন করতে নিষেধ করছেন? আর আপনি তা অমান্য করছেন? এরপরও আপনি নিজেকে ধার্মিক মনে করেন? কখনোই নয়।

শরীরের যেখানে যা দরকার, সেখানে তাই তিনি দিয়েছেন। কর্ণকুহর, নাসিকা গহ্বর, চোখের পাতার লোম, জীবাণুরোধ করার জন্য কত যে দরকারি তা আল্লাহই মা'লূম। বগলের নিচে, নাভির নিচের লোমগুলো কাটা সর্বোচ্চ সীমা হলো ৪০ দিন। প্রতি সপ্তাহে যদি আপনি পরিষ্কার করেন, তবে সবচেয়ে ভালো। অথচ মাসের পর মাস, বছর পার হয়ে যায়, তবুও পরিষ্কার করেন না। অথচ আপনি সপ্তাহে তিন দিন দাড়ি কাটেন! আপনি যেমন আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারী, তেমনি আপনি বড় নোংরাও বটে?

দাড়ির বিষয়ে মুসলিমরা মুসলিমদের শত্রু। অমুসলিম দেশে মুসলিমরা দাড়ি রাখতে ভয় পায়। কেননা, দাড়িওয়ালা ব্যক্তিদের কখনো কখনো নানাভাবে অত্যাচার করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের যদি দাড়ি থাকে, তাহলে শুধু দাড়ি রাখার জন্য আপনার উপর অত্যাচার হবে না। শুধু দাড়ি রাখার জন্য যদি কাউকে যদি ঘৃণা করা হয়, অত্যাচার করা হয়— এর জন্য দাড়িবিহীন সমস্ত মুসলিমগণ দায়ী। এটা স্বীকার করতেই হবে।

আর আপনি দাড়িকে ঘৃণা করছেন, অপছন্দ করছেন! রাসূল ﷺ দাড়িবিহীন ব্যক্তির দিকে তাকাতেন না। মুখ ঘুরিয়ে

কথা বলতেন।[১] দাড়িবিহীন মানুষকে তিনি কতটা অপছন্দ করতেন এটা তার প্রমাণ।

আপনি কীসের ঈমানদার? ঈমানের অর্থ শুধু বিশ্বাস নয়; ঈমানের অর্থ স্বীকৃতিও। আপনাকে কাজেও বাস্তবায়ন করতে হবে! আপনার চেহারাটাও মুসলিমদের মতো হওয়াটাও ঈমানের বাহ্যিক রূপ। আপনি দাড়ি চেঁছে অমুসলিম, মুশরিকদের মতো অবয়বে সমাজে নিজেকে ভাসাবেন? আর বলবেন, আমি মুসলিম? এতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আপনি দাড়িবিহীন থাকেন কী করে? আপনি কেমন মুসলিম, যে আপনার চেহারা দেখে বোঝা যায় না, আপনি মুসলিম কিনা! রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

নিজেদের আত্মসম্মান নিজেরা তৈরি করুন। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্মের অনুসারী হয়েও, বিশ্বের একমাত্র সমুন্নত জীবন ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়েও আপনি 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে' ভুগছেন? এ বড় লজ্জার কথা! তার মানে আপনি শিরদাঁড়াহীন মুসলিম? আপনি মূর্খ মুসলিম?

আপনি তো জানলেন, দাড়ি রাখা ওয়াজিব! কিন্তু আপনি কি জানেন 'ফরয' ও 'ওয়াজিব' এর অর্থ একই। এর অর্থ হলো— অপরিহার্য, অতি আবশ্যক এবং জরুরী। কখনো কখনো রাসূল ﷺ ফরয বুঝাতে ওয়াজিব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই মর্মে অনেক হাদীছও আছে। তবে একদল ফক্বীহ এই শব্দ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে এবং ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হবে না; ফাসিক্ব হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

'ফাসেক্ব'-এর অর্থ হলো, 'বের হয়ে যাওয়া', 'অবাধ্যতা'। পারিভাষিক অর্থ হলো, 'আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া'। একমাত্র 'পাপাচারী'ই আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়। তাহলে ফাসেক্বের সরাসরি অর্থ হলো, 'পাপাচারী' অথবা 'পাপিষ্ঠ'। দাড়ি কর্তনকারী যদি মিনিমাম ফাসেক্বই হন, তাহলেও তিনি দিন-রাত প্রকাশ্যে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত, পাপাচারী! আর এমন ব্যক্তি তওবা না করে মারা গেলে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আপনি একজন ছালাত আদায়কারী মানুষ, কেন দিন-রাত এভাবে ফাসেক্ব অবস্থায় থাকবেন? কেন জাহান্নামকে ভয় নেই আপনার? কোন বুদ্ধি, কোন সাহসে আপনি নিজেকে ধ্বংস করার এই সর্বনাশা কাজে লিপ্ত আছেন? আল্লাহর দেওয়া বিধান মানতে আপনার এত দ্বিধা কেন? কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে? নিশ্চয় আপনার অন্তর বক্র-রোগাক্রান্ত হয়ে গেছে! আপনার হৃদয়ে শয়তান বাসা বেধেছে! শয়তানকে বিতাড়িত করুন, আর ফিরে আসুন আসল ইসলামে!

মক্কার মুশরিকরাও তো আপনার মতো ছিল না। তারাও তো দাড়ি রাখত। আবূ জাহলের দাড়ি ধরেই তো তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রত্যেক নবী-রাসূলের দাড়ি ছিল। রাসূল ﷺ নিজে দাড়ি রেখেছেন, প্রত্যেক ছাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং তার পরবর্তী সমস্ত সালাফে ছালেহীনের দাড়ি ছিল। চার মাযহাবে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও দাড়ি রাখার বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। দাড়ি রাখার বিষয়ে একাধিক হাদীছে রাসূল ﷺ দাড়ি রাখতে আদেশ বা নির্দেশ করছেন। সুতরাং আপনাকে দাড়ি রাখতেই হবে। কোনো ফাঁকফোকর, ওযর-আপত্তির কোনো সুযোগ নেই। নিম্নে দাড়ি বিষয়ক কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো :

১. ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা গোঁফ বেশি ছোট করবে এবং দাঁড়ি বড় রাখবে'।[৩] ২. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা মোচ কেটে ফেলো এবং দাড়ি লম্বা করে অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো'।[৪] ৩. আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'দশ প্রকার কাজ ফিতরাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গত : (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেওয়া, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙুলের গ্রন্থিগুলো ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) নাভির নিম্নাংশের চুল কামানো এবং (৯) পানি দ্বারা শৌচ করা'। যাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসআব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি দশম কাজটি ভুলে গেছি। তবে সম্ভবত সেটা হবে কুলি করা।[৫]

সুতরাং আসুন! আমরা নারীর বেশ না ধরে দাড়ি রেখে ইসলামের এ বিধানটি গুরুত্বের সাথে পালন করি।

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৪৬৭।
২. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাসান ছহীহ।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯; মিশকাত, হা/৪৪২১।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০।
৫. ইবনু মাজাহ, হা/২৯৩; তিরমিযী, হা/২৭৫৭, হাদীছ ছহীহ।

কবরের প্রথম প্রহর

-উম্মে আয়মান*

মৃত্যু এক অমোঘ সত্য। জগতে যার প্রাণ আছে, তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আল্লাহ তাআলাই জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু হবে আমাদের বারযাখী বা পারলৌকিক জীবন। কবর পরকালের প্রথম ঘাঁটি। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ভালো আমল করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুতি নেবে, কবর তার জন্য সুখ ও আনন্দের ঘর। আর যে ব্যক্তি খারাপ আমল করবে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করবে না, কবর তার জন্য ভীতি ও অন্ধকারের ঘর। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘কবর পরকালের প্রথম ঘাঁটি। কেউ যদি এখান থেকে মুক্তি পায়, তাহলে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো তার জন্য সহজ হবে। আর যদি কেউ কবর থেকে মুক্তি না পায়, তাহলে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো তার জন্য আরও কঠিন হবে’।[১]

কবরজীবন কেমন হবে, তার প্রথম প্রহর কীভাবে কাটবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি দীর্ঘ হাদীছ আমরা পাই। এ পর্বে এমনই একটি হাদীছ উপস্থাপন করব।

বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জনৈক আনছারীর জানাযায় বের হলাম, আমরা তার কবরের কাছে যখন পৌঁছলাম, তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন, আমরা তার চারপাশে বসলাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তার (রাসূল ﷺ) হাতে একটি কাঠ ছিল, তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন, অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন, ‘তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে পানাহ চাও’ দুই অথবা তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, ‘নিশ্চয় মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া হতে প্রস্থান ও আখেরাতের জীবনে পা রাখার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়, তখন তার নিকট আসমান থেকে সাদা চেহারার ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন, যেন তাদের চেহারা সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে, অবশেষে তারা তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসে যায়। অতঃপর মালাকুল মাউত আসেন ও তার মাথার নিকট বসেন, তিনি বলেন, হে পবিত্র রূহ! তুমি আল্লাহর মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হও। তিনি (রাসূল ﷺ) বলেন, ‘ফলে রূহ বের হয় যেমন মটকা বা কলসি থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি তা গ্রহণ করেন, যখন গ্রহণ করেন তিনি নিজ হাতে না রেখে চোখের পলকে তার সঙ্গে নিয়ে আসা কাফন ও সুগন্ধির মধ্যে রাখেন, তার থেকে উৎকৃষ্টতর ঘ্রাণ বের হয়, যা দুনিয়াতে পাওয়া যায়’। তিনি ﷺ বলেন, ‘অতঃপর তাকে নিয়ে তারা ওপরে ওঠে, তারা যখনই তার রূহসহ ফেরেশতাদের কোনো দলকে অতিক্রম করে তখনই তারা বলে, কার এই পবিত্র রূহ? তারা বলে, অমুকের সন্তান অমুক, সবচেয়ে সুন্দর নামে তাকে ডাকে, যে নামে দুনিয়াতে ডাকা হতো, তাকে নিয়ে তারা দুনিয়ার আসমানে পৌঁছে, তার জন্য তারা আসমানের দরজা খোলার অনুরোধ করেন। তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাকে প্রত্যেক আসমানের নিকটবর্তীরা পরবর্তী আসমানে অভ্যর্থনা জানিয়ে পৌঁছে দেয়, এভাবে তাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ বলেন, ‘আমার বান্দার দফতর ইল্লিয়ীনে লিখো এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি তা (মাটি) থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সেখানে তাদেরকে ফেরত দেব এবং সেখান থেকেই তাদেরকে পুনরায় উঠাবো’। তিনি ﷺ বলেন, ‘অতঃপর তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এরপর তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসবে, তারা তাকে বসাবে অতঃপর বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা বলবে, তোমার দ্বীন কী? সে বলবে, আমার দ্বীন ইসলাম। অতঃপর বলবে, এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলবে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। অতঃপর তারা বলবে, কীভাবে জানলে? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তাতে ঈমান এনেছি ও তা সত্যায়ন করেছি। অতঃপর এক ঘোষণাকারী আসমানে ঘোষণা দিবে, আমার

* পলাশী, রাজশাহী।

১. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৬৭, হাদীছ হাসান।

বান্দা সত্য বলেছে। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও'। তিনি ﷺ বলেন, 'ফলে তার কাছে জান্নাতের সুঘ্রাণ ও সুগন্ধি আসবে, তার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে'। তিনি ﷺ বলেন, 'তার নিকট সুদর্শন চেহারা, সুন্দর পোশাক ও সুঘ্রাণসহ এক ব্যক্তি আসবে, অতঃপর বলবে, তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটা তোমার ঐ দিন, যার ওয়াদা তোমাকে করা হতো। সে তাকে বলবে, তুমি কে? তোমার এমন চেহারা যে শুধু কল্যাণই নিয়ে আসে? সে বলবে, আমি তোমার নেক আমল। সে বলবে, হে আমার রব! ক্বিয়ামত ক্বায়েম করুন, যেন আমি আমার পরিবার ও সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি'।

তিনি ﷺ বলেন, 'আর কাফের বান্দা যখন দুনিয়া থেকে প্রস্থান ও আখেরাতে যাত্রার সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়, তার নিকট আসমান থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা অবতরণ করেন, তাদের সাথে থাকে 'মুসূহ' (মোটা কাপড়), অতঃপর তারা তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসে যায়, অতঃপর মালাকুল মাউত আসেন ও তার মাথার কাছে বসেন। অতঃপর বলেন, হে খবীছ আত্মা! আল্লাহর রাগ ও গযবের জন্য বের হও'। তিনি ﷺ বলেন, 'ফলে তাকে তার শরীর থেকে পৃথক করা হয়, অতঃপর সে তাকে টেনে বের করে, যেমন ভেজা উল থেকে (লোহার) সিক বের করা হয়। যখন গ্রহণ করেন তিনি নিজ হাতে না রেখে চোখের পলকে ফেরেশতারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা ঐ মোটা কাপড়ে রাখে, তার থেকে মৃত দেহের যত কঠিন দুর্গন্ধ দুনিয়াতে হতে পারে, সে রকমের দুর্গন্ধ বের হয়। অতঃপর তাকে নিয়ে তারা ওপরে উঠে, তাকেসহ তারা যখনই ফেরেশতাদের কোনো দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখনই তারা বলে, এ খবীছ রূহ কার? তারা বলে, অমুকের সন্তান অমুকের, সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম ধরে ডাকা হয় যার মাধ্যমে তাকে দুনিয়াতে ডাকা হতো। এভাবে তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে যাওয়া হয়, তার জন্য দরজা খুলতে বলা হয়, কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হবে না'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করেন, ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ 'তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সুচের ছিদ্রতে প্রবেশ করে' *(আল-আ'রাফ, ৭/৪০)*। 'অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, তার আমলনামা যমীনের সর্বনিম্নে অবস্থিত সিজ্জীনে লিখো। অতঃপর তার রূহ সজোরে নিক্ষেপ করা হয়'। অতঃপর তিনি ﷺ তেলাওয়াত করেন, ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ 'আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে দূরের কোনো জায়গায় নিক্ষেপ করল' *(আল-হাজ্জ, ২২/৩১)*। 'তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসে ও তাকে বসায়, তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে বলে, হায় আফসোস! আমি জানি না। অতঃপর তারা বলে, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, হায় আফসোস! আমি জানি না। অতঃপর তারা বলে, এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলে, হায় আফসোস! আমি জানি না। অতঃপর আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, সে মিথ্যা বলেছে, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার দরজা জাহান্নামের দিকে খুলে দাও। ফলে তার নিকট তার তাপ ও বিষ আসবে এবং তার ওপর তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করা হবে যে, তার পাঁজরের হাড় একটির মধ্যে অপরটি ঢুকে যাবে। অতঃপর তার নিকট বীভৎস চেহারা, খারাপ পোশাক ও দুর্গন্ধসহ এক ব্যক্তি আসবে, সে তাকে বলবে, তোমাকে দুঃখ দিবে এমন বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো, এটা হচ্ছে তোমার ঐ দিন, যার ওয়াদা তোমাকে করা হতো। সে বলবে, তুমি কে? তোমার এমন চেহারা কেবল অনিষ্টই নিয়ে আসে? সে বলবে, আমি তোমার খবীছ আমল (অসৎকর্ম)। সে বলবে, হে রব! ক্বিয়ামত ক্বায়েম করো না।[২]

উক্ত হাদীছে আখেরাতের প্রথম মনযিল কবরে মুমিন ব্যক্তির শান্তি ও কাফের ব্যক্তির শাস্তির ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়াবী জীবনে আমরা সৎকাজ করার ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২. আহমাদ, হা/১৮৫৫৭; আবূ দাউদ, হা/৪৭৫৩, হাদীছটি ছহীহ।

সময়ের গুরুত্ব

[সূরা আল-আছর অবলম্বনে]

-শাহিন বিন আব্দুল গণী
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

কসম খেয়ে বললেন আল্লাহ
সময়ের গুরুত্ব দিতে,
নয়তো তুমি ধ্বংস হবে
দুনিয়া ও আখেরাতে।
সময় যদি না ব্যয় কর
ঈমান বৃদ্ধির কাজে,
নয়তো সময় নষ্ট হবে
অযথা ও বাজে।
পেলে সময় করিও আমল
সবার আগে নিজে,
আল্লাহর স্মরণে সদা তুমি
জিহ্বা রাখো ভিজে।
হক্কের দাওয়াত দিবে তুমি
সত্য নিও খুঁজে,
মানুষকে যেন দিতে পার
সত্য মিথ্যা বুঝে।
এসব কাজে ধৈর্য ধরে
যদি হও সমাজে নিচু,
মূল্য পাবে আল্লাহর কাছে
জান্নাত হবে উঁচু।

পানি পানের আদব

-ফাতেমা
ছাত্রী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

এক দুই তিন
আল্লাহ তাওফীক্ব দিন।
চার পাঁচ ছয়
নবীর পথে চলতে কই।
সাত আট নয়
বসে পানি পান করতে হয়।
এক-এ শূন্য দশ
ডান হাতে গ্লাস নিয়ে বস।
এগারো বারো তেরো
ডান হাতে গ্লাস ধরো।
চৌদ্দ পনের ষোল
শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলো।
সতের আঠারো উনিশ
শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' না ভুলিস।
দুই-এ শূন্য বিশ
তিন নিঃশ্বাসে পান করিস।

শান্তির ছায়াতলে

-কাওছার আনছারী
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় পেতে হলে
ইসলামী পথে চলো ভাই,
মনে রেখো এটা ছাড়া জীবনে
বিকল্প আর কিছু নাই।
দুনিয়া-আখেরাতে উভয় জাহানে
হতে চাও যদি সুখী,
কুরআন-হাদীছকে আঁকড়ে ধরে
হয়ে যাও ইসলামমুখী।
ছেড়ে দাও ভ্রান্তির যত আছে পথ
ত্বাগূতকে করে দাও বর্জন,
ইসলাম অনুযায়ী জীবনকে গড়ে নিয়ে
শান্তিকে করে নাও অর্জন।
এই পথে পাবে তুমি আশার বাণী
অশান্তি হবে দূরীভূত,
পরতে পরতে পাবে শান্তির বাণী
জীবনটা হবে আলোকিত।

মা

-মিফতাউল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

মায়ের স্নেহ-মমতা দেখো ঠিক এক সুশ্রী মধু,
সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা দিল জগতের প্রভু।
সন্তান খাবে না তবু মা আদর করে খাওয়াবে,
সন্তানের অসুখ হলে চোখের জলে বান ভাসাবে।
খোকন রোগা যখন ডায়েট প্ল্যান বানাবে ভেবে,
আব্বাকে বলে মা দুধ কলা বেদানা আনাবে তবে।
সন্তানের খেয়াল রেখে নিজে ঘুম ছাড়ে অহরহ,
নিজে না খেয়ে সন্তানের খাবার করে সরবরাহ।
স্নেহ যত্ন আদরে মা বড় করে সন্তানকে শুধু,
সন্তানের ভালো দেখতে চাই মজুরি চাই না কিছু।

বাংলাদেশ সংবাদ

পদ্মা সেতুর উদ্বোধন : খুলল স্বপ্নের দুয়ার

অবশেষে দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করা হলো গত ২৫শে জুন। সেতুটির নাম রাখা হয়েছে 'পদ্মা বহুমুখী সেতু'। মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার, প্রস্থ ৫৯.৪ ফুট। দুই প্রান্তে সংযোগ সড়ক ১৪ কিলোমিটার। এর পিলার সংখ্যা ৪২টি, স্প্যান ৪১টি। অবস্থান তিনটি জেলা মুন্সিগঞ্জ (মাওয়া), শরীয়তপুর (জাজিরা) ও মাদারীপুর (শিবচর)-এর সংযোগস্থলে। সেতুটির ভূমিকম্প সহনীয় মাত্রা রিখটার স্কেলে ৯। এ সেতুতে সড়ক ও রেলপথ ছাড়াও থাকবে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন যুক্ত করার সুবিধা। বিশ্বের বৃহত্তম সড়কসেতুর তালিকায় এর অবস্থান ২৫তম এবং এশিয়ায় দ্বিতীয়। এ সেতুর প্রকল্প ব্যয় ৩০ হাজার ৭৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। অর্থ বিভাগের সাথে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী, অর্থবিভাগ ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ২৬ নভেম্বর। প্রকল্পের বিবরণ অনুযায়ী, মূল সেতু নির্মাণের কাজটি করেছে চীনের ঠিকাদার কোম্পানি চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (MBEC) এবং নদীশাসন করেছে চীনের সিনো হাইড্রো কর্পোরেশন। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সেতুর নির্মাণকাজে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারে প্রথম স্প্যান বসানোর মাধ্যমে পদ্মা সেতুর অংশ দৃশ্যমান হয়। পরে একের পর এক ৪২টি পিলারের ওপর বসানো হয় ৪১টি স্প্যান। ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর শেষ ৪১তম স্প্যান স্থাপনের মাধ্যমে বহুমুখী ৬.১৫ কিলোমিটার পদ্মা সেতুর সম্পূর্ণ কাঠামো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সক্ষমতার মাইলফলক। এই সেতু চালুর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত হবে। নদীর ওপারে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বিকাশ ঘটবে। জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ১.২৩ শতাংশ। বাড়বে ২৯ শতাংশ নির্মাণ কাজ, ৯.৫ শতাংশ কৃষি প্রবৃদ্ধি, ৮ শতাংশ উৎপাদন ও পরিবহণ খাতের কাজ। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হবে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এই সেতুর বহুমুখী অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৃদ্ধি তো বটেই, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই সেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ সেতুতে থাকছে বহুমুখী সুবিধা যেমন— অফিস, ল্যাবরেটরি, মসজিদ, মোটেল, মেস, রিসোর্ট, ৩০টি ডুপ্লেক্স বাড়ি, ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নিরাপত্তা রক্ষীদের আবাসস্থল, বিদ্যুতের সাব-ডিভিশন, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

একনজরে পদ্মা সেতু :

পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য : ৬.১৫ কিলোমিটার
পদ্মা সেতুতে পিলার সংখ্যা : ৪২টি
পদ্মা সেতুতে পাইল সংখ্যা : ২৯৪টি
ল্যাম্পপোস্ট : মূল সেতুতে ৩২৮টি, ভায়াডাক্টে ৮৭টি।
পদ্মা সেতুতে সড়ক পথ : চার লেইন, চাওড়া ২১ মিটার।
পদ্মা সেতুতে রেলপথ : সিংগেল ট্র্যাক ডুয়াল গেজ।
সেতুর পাইলিংয়ের সর্বোচ্চ গভীরতা : ৪১১.৫০ ফুট।
পদ্মা সেতুর ধরন : দ্বিতলবিশিষ্ট (ওপরে যানবাহন চলাচলের পথ এবং নিচে রেলপথ)।
পদ্মা সেতু প্রকল্পে কাজ করেছে : একসঙ্গে ৫০০০ মানুষ।
পদ্মা সেতুতে মোট ব্যয় হয়েছে : ৩০,১৯৩ কোটি টাকা।

বন্যায় ভাসছে সিলেট-সুনামগঞ্জ

বন্যার এমন ভয়াবহ রূপ আগে দেখেনি সিলেটের মানুষজন। বন্যার পানির এমন আকস্মিক বৃদ্ধিতে হতভম্ব ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ মানুষ। ভয়াবহ বন্যার শিকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়েও জায়গা পাচ্ছেন না। শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে রয়েছেন সিলেটের বানভাসি মানুষ। এছাড়া জেলার কৃষকরা তাদের গৃহপালিত পশু নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সিলেট বিভাগের বেশিরভাগ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। টেলিফোন নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ বিভাগ নিরাপত্তার স্বার্থে ও দুর্ঘটনা এড়াতে পুরো জেলার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বলা যায় সিলেট বিভাগ কার্যত সারা দেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এবারের বন্যায় সিলেট নগরের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিলেট জেলার ভারতের সীমান্তঘেঁষা উপজেলা গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট এবং সিলেট সদর। এই পাঁচ উপজেলার প্রায় পুরোটাই

পানিতে তলিয়ে গেছে। সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক, গোয়াইনঘাট-সালুটিকর-সিলেট সড়কও পানির নিচে। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিলেটের সীমান্তবর্তী এ উপজেলাগুলোর সড়ক যোগাযোগ। এছাড়াও পুরো সুনামগঞ্জ শহরের ৯০ ভাগ বসতঘরে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। ছাতক শহরের শতভাগ এলাকা বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সুনামগঞ্জ ও ছাতক পৌর এলাকার প্রধান সড়কে হাঁটু থেকে কোমর পানিতে ডুবে আছে। শহরের প্রধান সড়কগুলোতে অনায়াসে নৌকা চলাচল করছে। ৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক কোমর পানিতে ডুবে থাকায় সুনামগঞ্জের সঙ্গে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়েছে। জেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ছাতক, তাহিরপুর দোয়ারাবাজার, বিশ্বম্ভপুর উপজেলা। এসব এলাকার প্রধান সড়কে এখন সাতার পানিতে নিমজ্জিত। নৌকা ছাড়া এসব উপজেলায় যাওয়ার বিকল্প কোনো বাহন নেই। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গে সীমান্তের ওপারে ভারী বর্ষণের সঙ্গে পাহাড়ি ঢলে তিস্তা ছাড়াও ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, ঘাঘটসহ ১৬ নদ-নদীর পানি বাড়ছে। নীলফামারীর ডিমলা, জলঢাকা, লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা, কালীগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের অন্তত ১০ হাজার পরিবার বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে। এদিকে, রৌমারী ও রাজিবপুর ছাড়াও কুড়িগ্রাম জেলার আরও তিনটি উপজেলার অনেক ইউনিয়ন নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। জেলার অনেক গ্রাম তলিয়ে গেছে। ঘরবাড়িতে পানি ওঠায় মাচা বা নৌকায় আশ্রয় নিয়েছেন অনেকে। এদিকে ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকায় বন্যার আরও অবনতির পূর্বাভাস দিয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ইয়ামানে প্রায় ২ কোটি মানুষ অনাহারে

ভয়াবহ মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে ইয়ামানে। ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) জানিয়েছিল তহবিলের অভাবে এই সংস্থা ইয়ামানের ৮০ লাখ দরিদ্র মানুষকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার মাত্রা কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সংস্থাটি গত মাসে আরও এক দফা খাদ্য সহায়তার মাত্রা কমিয়ে আনার কথা ঘোষণা করে। এ পরিস্থিতির পেছনে অর্থ সাহায্যের অভাব, বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবকে দায়ী করা হচ্ছে। ফলে দেশটিতে এক কোটি ৯০ লাখেরও বেশি মানুষ এখন অনাহারে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে তাদের এক প্রতিবেদনে। ইয়ামানে ত্রাণ সাহায্যের বাজেট বা তহবিল কমিয়ে দেওয়ার কারণে দেশটির ৫০ লাখ ইয়ামানী তাদের দৈনিক প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম খাদ্য পাবে এখন থেকে এবং ৮০ লাখ ইয়ামানী তাদের দৈনিক চাহিদার এক-তৃতীয়াংশেরও কম খাদ্য পাবে এখন থেকে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ ইয়ামানে অপুষ্টির মারাত্মক শিকার ৫০ হাজারেরও বেশি শিশুর চিকিৎসা সেবা দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে জুলাই থেকে। একইসঙ্গে জাতিসংঘ ইয়ামানের মা ও শিশু বিষয়ক স্বাস্থ্য-সেবা কর্মসূচি বন্ধ করে দেবে, ২৫ লাখ ইয়ামানী শিশু ও এক লাখ ইয়ামানী মা এ কর্মসূচির আওতায় সেবা পেতেন। মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন বসতি আর আরব বিশ্বের সবচেয়ে গরীব দেশ ইয়ামান। গৃহযুদ্ধে দেশটি পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

রেকর্ডের পাতায় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আবারও গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠল সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন দেশ ও জাতির শিক্ষার্থীদের জায়গা করে দিয়ে এ রেকর্ড অর্জন করেছে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এই বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগে ২০১৭ সালেও এই রেকর্ড অর্জন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. মামদূহ বিন সঊদ বিন সানয়ান আলে সঊদের হাতে নতুন করে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সম্মাননা সনদ তুলে দেওয়া হয়েছে। সারা বিশ্বে মধ্যপন্থা, সহাবস্থান, শান্তি, সম্প্রীতিবোধ প্রসারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করা হয়। প্রতিবছর সঊদী সরকারের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন বিশ্বের নানা দেশের জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা, আবাসন ও যানবাহনের পুরো ব্যয় বহন করে বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষ। ১৯৬২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সঊদী বাদশাহ সঊদ বিন আব্দুল আযীযের রাজকীয় নির্দেশনায় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। ইসলামী শরীআহ, দাওয়াহ, কুরআন, হাদীছ ও আরবী বিভাগের পাশাপাশি ২০০৯ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ খোলা হয়। এসব বিভাগে ১৭০টিরও বেশি দেশের ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। বিশ্বের ৫০টিরও বেশি ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনমেলা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিশ্বের সবচেয়ে বড় উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

বিশ্বের সবচেয়ে বড় উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এটি একটি ‘সী গ্রাস’ বা সামুদ্রিক ঘাস যা নিউইয়র্কের ম্যানহাটন এলাকার চাইতেও তিন গুণ বড়। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকূলে এই গাছটির সন্ধান পাওয়া গেছে। গাছটির জিনগত পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে পানির নিচের বৃহৎ এই ঘাসটি আসলে একটিই গাছ। ধারণা করা হচ্ছে, একটি মাত্র বীজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর ধরে গাছটি বেড়ে উঠেছে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন, এই সী গ্রাস ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তারা বলছেন, এই উদ্ভিদের আকার ২০,০০০ ফুটবল মাঠের সমান। অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহর থেকে ৮০০ কিলোমিটার উত্তরে শার্ক বে-তে অনেকটা আকস্মিকভাবেই বিজ্ঞানীরা এই উদ্ভিদের খোঁজ পান। এর পর তারা এই উদ্ভিদের জিনগত বৈশিষ্ট্য বোঝার চেষ্টা করেন। এই সী গ্রাস ‘রিবন উইড’ নামেও পরিচিত। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকূলে এই উদ্ভিদটি পাওয়া যায়। গবেষণার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা উপকূল থেকে এই গাছটির অঙ্কুর সংগ্রহ করেন এবং প্রতিটি নমুনা থেকে একটি করে ‘ফিঙ্গার প্রিন্ট’ তৈরি করতে ১৮ হাজার জেনেটিক মার্কার পরীক্ষা করেন। এর মাধ্যমে তারা সেখানে কতগুলো উদ্ভিদ আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করেন। সকল পরীক্ষার শেষে তারা উত্তর পান সেখানে মাত্র একটিই গাছ *(সুবহানাল্লাহ)*। এই উদ্ভিদটি বছরে ৩৫ সেন্টিমিটার করে বাড়ে এবং এই হিসাব থেকে গবেষকরা বের করেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় আসতে এই গুল্মের ৪,৫০০ বছর লেগেছে (তথ্যসূত্র : বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী Proceedings of the Royal Society B)।

আদ-দাওয়াহ সংবাদ

দ্বিতীয় দফায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

সিলেট, ২৩ জুন ২০২২ : নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ এর সহযোগিতায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চালীয় জেলা সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যাকবলিত প্রায় ৫০০০ পরিবারের মাঝে দ্বিতীয় দফায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। সিলেট ও সুনামগঞ্জের প্রায় সকল উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। সিলেট অঞ্চলে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় দাওয়াহ ইলাল্লহ এর কর্মীরা সিলেট ও সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেন। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর কোষাধ্যক্ষ ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর সদস্যগণ। উল্লেখ্য, ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, চিড়া, মুড়ি, লবণ, আলু, পেয়াজ, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ওরস্যালাইন ও সাবান।

কুড়িগ্রাম, ২৯ জুন ২০২২ : সিলেটের পর উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় কুড়িগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর কর্মীরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। প্রায় ছয় শতাধিক পরিবারের মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়। নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ নিজে উপস্থিত থেকে ত্রাণ বিতরণ করেন।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : মানুষদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ উত্তম নাকি ফেরেশতাগণ উত্তম?

-রাশেদুজ্জামান
ফরিদপুর।

উত্তর : এই মাসআলাতে আলেমগণের মাঝে মতভেদ আছে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, পরিণতির দিক দিয়ে সৎকর্মশীল মানুষ ফেরেশতাগণের চেয়ে উত্তম। কেননা তারা যে প্রতিদান পাবে তা ফেরেশতাগণ পাবে না। এমনকি জান্নাতের দরজাতে ফেরেশতাগণই এই সৎকর্মশীল মানুষদেরকে সালাম দিবেন। তারা বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম (আর-রাদ, ১৩/২৪)। আর সূচনার দিক দিয়ে ফেরেশতাগণ মানুষের চেয়ে উত্তম। কেননা তাদেরকে নূর থেকে তৈরি করে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তাই করে (আত-তাহরীম, ৬৬/৬)। আল্লাহ আরো বলেন, 'আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার-বশে তার ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না' (আল-আম্বিয়া, ২১/১৯-২০)। অতএব সূচনার দিক থেকে ফেরেশতাগণ শ্রেষ্ঠ আর পরিণতির দিক থেকে সৎকর্মশীল মানুষই ফেরেশতাগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনু তায়মিয়্যাহ, ৪/৩৪৩)।

প্রশ্ন (২) : কুরআন নিয়ে কসম করা যাবে কি?

-সোহেল রানা
বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহ তাআলা বা তার কোনো গুণবাচক নাম বা তার কোনো ছিফাত ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর নামে কসম করা জায়েয নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কেউ যদি কসম করতেই চায়, তাহলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৭৯, ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৬)। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করলো, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল' (তিরমিযী, হা/১৫৩৫)। আর কুরআন সৃষ্টি নয়, বরং কুরআন হলো আল্লাহর কালাম বা কথা। কথা বলা আল্লাহর একটি গুণ। তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন। সুতরাং কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম, আর আল্লাহর কালাম তার গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু কুরআন নিয়ে কসম করা জায়েয (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ১৫৭ পৃ.)।

প্রশ্ন (৩) : রিযিক ও বিবাহ কি লাওহে মাহফূযে লিখা আছে?

-আলী হোসেন
দিনাজপুর।

উত্তর : হ্যা, বিবাহ ও রিযিক লাওহে মাহফূযে লিখিত আছে। আল্লাহ তাআলা যেদিন কলম সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলূক্ব সৃষ্টি হবে, তার সবই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি করে বললেন, লেখো'। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব? আল্লাহ তাআলা বললেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবই লিখো'। সে সময় ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে, কলম সব কিছুই লিখে ফেলল (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৭৫৭)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'ভ্রূণ মাতৃগর্ভে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন এবং লিখে দেন তার রিযিক, বয়স, আমল ও তিনি সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৫৪; ইবনু মাজাহ, হা/৭৬)। আর রিযিক যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, বিবাহ করাও সেভাবে নির্ধারিত আছে। এই পৃথিবীতে কে কার স্বামী বা স্ত্রী হবে, তাও নির্দিষ্ট রয়েছে। কেননা আসমান-যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

প্রশ্ন (৪) : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কোনো মহিলা মারা গেলে তিনি কি শহীদের মর্যাদা পাবে?

-মাসুম মাহমুদ
নরসিংদী।

উত্তর : হ্যাঁ, এমন মহিলা শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূল ﷺ একদা ছাহাবীগণকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ হিসাবে গণ্য করবে? ছাহাবীগণ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হয় সেই শহীদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা কম হয়ে যাবে। (আরো শহীদ আছে, তারা হলো) আল্লাহ তাআলার রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, প্লেগ রোগে নিহত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় নিহত ব্যক্তি শহীদ

www.al-itisam.com

ও প্রসব বেদনায় নিহত মহিলা শহীদ' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৭৭২; ইবনু মাজাহ, হা/২৮০৪)। উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের যে সকল মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদের মর্যাদা পাবে।

প্রশ্ন (৫) : কোনো মানুষ মৃত্যুর পর তার আত্মা ৪০ দিন পর্যন্ত বাড়িতে আসা যাওয়া করে এবং তার পরিবারের মানুষের কার্যকলাপ দেখে। এ ধারনা কি সঠিক?

-মো. সোহেল রানা
জয়পুরহাট।

উত্তর : কোনো মানুষ মৃত্যুর পর তার আত্মা ৪০ দিন নয়, বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোনো বাড়িতে বা দুনিয়াতে আসতে পারবে না। এটি মানুষের ভুল ধারণা। পাপী লোকদের রূহ বা আত্মা সিজ্জীন নামক যায়গায় অবস্থান করবে। আর ঈমানদার মানুষের আত্মা ইল্লিয়্যীন নামক জায়গায় অবস্থান করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কখনোই নয়, অপরাধীদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে' (মুতাফফিফীন, ৮৩/৮)। আর ঈমানদারের আমলনামা রয়েছে ইল্লিয়্যীনে' (মুতাফফিফীন, ৮৩/২০)। যাদের সৎকাজের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই ওরা যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, জাহান্নামে তারা চিরস্থায়ী হবে' (আল-মুমিনূন, ২৩/১০২-১০৩)। এই দুই আয়াত প্রমাণ করে যে, আত্মা কোনো বাড়িতে বা দুনিয়ায় আসবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মারা যায় (কবরে) তাকে সকাল-সন্ধ্যায় তার (ভবিষ্যৎ) অবস্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তার অবস্থান জান্নাত। আর যদি জাহান্নামী হয় তবে তার অবস্থান জাহান্নামে দেখানো হয়। আর তাকে বলা হয় এটাই তোমার প্রকৃত অবস্থান। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাকে উঠিয়ে সেখানে প্রেরণ করবেন' (বুখারী, হা/১৩৭৯ মুসলিম, হা/২৮৬৬ মিশকাত, হা/১২৭)। উপরের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা দুনিয়াতে ফেরত আসে না। বরং এটি মানুষের ভুল ধারনা।

প্রশ্ন (৬) : নাপাক অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে কি?

-শাহাবুর রহমান
ঝিনাইদহ।

উত্তর : সর্বদা ওযূ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করাই উত্তম (আবূ দাঊদ, হা/১৭)। তবে ছোট ও বড় নাপাক ব্যক্তি এবং ঋতুবতী মহিলারাও কুরআন স্পর্শ করতে পারবে। আর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না' (দারেমী, হা/২২৯১৭)। এখানে পবিত্র ব্যক্তি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো মুমিন ব্যক্তি। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বলেছিলেন, 'মুমিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না' (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৫, ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭১)। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি ওযূ অবস্থাতেই থাক অথবা নাপাক অবস্থাতেই থাক সর্বাবস্থায় সে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে (নাইলুল আওতার, ১/২৫৯)।

প্রশ্ন (৭) : নাবালক শিশু মারা গেলে তাদের রূহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোথায় থাকবে? কবরে তাদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কিভাবে রাখা হবে?

-রাসেল ইসলাম
পাংশা, রাজবাড়ি।

উত্তর : মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাদের রূহগুলো আলামে বারযাখে অবস্থান করে। তাই নাবালক শিশু মারা গেলেও তাদের রূহ আলামে বারযাখে অবস্থান করবে। তবে তাদেরকে কবরে না রেখে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর তত্বাবধায়নে রাখা হবে। সামূরা ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, '... বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোকটিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)। আর তাঁর চারপাশে যে বালকগুলো ছিল তারা এ সমস্ত শিশু যারা দ্বীনে ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করেছে'। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুসলিমদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর মুশরিকদের সন্তান? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তারাও সেখানে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪৭; মিশকাত, হা/৪৬২৫)।

বিদআত

প্রশ্ন (৮) : সমাজে প্রচলিত আছে যে, নতুন বাড়িতে উঠার সময় কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয় এবং আশেপাশের লোকদেরকে দাওয়াত করা হয়। এটি কি শরীআতসম্মত?

-সাবিকুল ইসলাম
নাটোর।

উত্তর : না, এমনটি করা শরীআতসম্মত নয়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবীগণের থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তারা বাড়ি উদ্বোধনের সময় দলবদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন। আর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ যদি এমন কোনো আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তাহলে সেটি বর্জনীয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তবে কোনো পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে অথবা নিজে বরকতের আশায় দুই রাকআত ছালাত আদায় করতে পারে। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ইয়াতীম রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলাম। আর আমার মা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৭; মিশকাত, হা/১১০৮)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৯) : ওযূর পরে নারীদের জরায়ু দিয়ে বাতাস বের হলে তাতে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-আলামিন হোসেন
পাবনা।

উত্তর : ওযূর পর জরায়ুর রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে তাতে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ এটি কোনো অপবিত্র স্থান থেকে বের হয় না। তাছাড়া হাদীছে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দলীল নেই। আর আসল বা মূল হলো পবিত্রতা। তাই ছহীহ দলীল ছাড়া ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে হুকুম দেয়া যাবে না (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ৫/২৮০; মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ১১/১৯৭; ফাতহুল আল্লাম, ১/৩১২)।

প্রশ্ন (১০) : অনেক সময় কাপড় এবং চাদরে বীর্য লেগে যায়। এটি কি ধৌত করতে হবে নাকি শুকিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে?

-এমদাদুল হক
ফেনী।

উত্তর : বীর্য শুকনো থাকলে নখ দিয়ে খুচিয়ে তুলে দিলেই তা যথেষ্ট হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯০)। আর ভেজা হলে কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলবে। চিহ্ন দেখা না গেলে পানি ছিটিয়ে দিবে। এটাই যথেষ্ট হবে। একদিন জনৈক ব্যক্তি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘরে মেহমান হলো। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা দেখলেন, ভোরে সে তার কাপড় ধৌত করছে (অর্থাৎ রাত্রে তার স্বপ্নদোষ হয়েছিল) তা দেখে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, মূলত তোমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট হতো যে, তুমি বীর্য দেখে থাকলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে নিতে। আর যদি তা না দেখে থাক, তাহলে জায়গাটিতে পানি ছিটিয়ে নিতে পারতে। কেননা এমনও হয়েছে আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য রগড়িয়ে ফেলেছি, আর তিনি সে কাপড় পরেই ছালাত আদায় করেছেন (মুসলিম, হা/২৮৮, আবূ দাঊদ, হা/৩৭১)।

প্রশ্ন (১১) : সহবাস করার সময় শরীরে যে কাপড় থাকে সেই কাপড় পরে কি ছালাত আদায় করা যাবে?

-আব্দুল কাইয়ুম
নীলফামারী।

উত্তর : হ্যাঁ, সহবাসকালীন শরীরে থাকা পোশাক পরে ছালাত আদায় করা যাবে। সহবাসে কেবল গোসল করা ফরয হলেও কাপড় ধোয়া ফরয নয়। কেননা সহবাসের কারণে কাপড় নাপাক হয় না। এমনকি কাপড়ে বীর্য লেগে গেলেও কাপড় নাপাক হয় না। বরং কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে উক্ত স্থান ধুয়ে বা ঘষে বীর্য তুলে ফেলবে এবং তাতেই ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ সাধারণভাবে বীর্য নাপাক নয়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন (মুসলিম, হা/২৮৮)। যদি তা অপবিত্র হতো, তাহলে ধুয়ে ফেলা আবশ্যক হতো (মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনু তায়মিয়্যাহ, ২১/৬০৪-৬০৫)।

প্রশ্ন (১২) : পায়ুপথ দিয়ে কৃমি বের হলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-মাহির ফয়ছাল
দিনাজপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, পায়ুপথ দিয়ে পাথর, কৃমি এবং চুলসহ যা কিছু বের হবে তাতে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে (আল-মুগনী, ১/২৩০)। পায়ুপথ দিয়ে বের হওয়া কৃমি, পাথল, চুল, গোশতের টুকরা বা অনুরূপ সবই অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে তারপর তার সন্দেহ দেখা দেয় যে, পেট থেকে কিছু বের হলো কি-না তখন সে যেন মসজিদ থেকে কখনো বের না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে (বায়ু বের হবার) কোনো শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায়’ (বুখারী, হা/১৩৭; মুসলিম, হা/৩৬২; মিশকাত, হা/৩০৬)। অর্থাৎ বায়ু বের হওয়ার কারণে যখন ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে কৃমি বের হলে ওযূ ভঙ্গ হওয়া অধিক যৌক্তিক (তা‘লীক্বাত ‘আলাল কাফী লি ইবনে কুদামাহ ইবনু উছায়মীন, ১/১২৮)।

ছালাত

প্রশ্ন (১৩) : মাঝে মধ্যে কোনো কারণে মসজিদে জামাআতে ছালাত আদায় করা হয় না। আর বাড়িতে ছালাত আদায় করার সময় আমার স্ত্রী চায় যে, আমরা দুজনে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করি। এখন প্রশ্ন হলো, স্বামী-স্ত্রী জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত, মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথেই ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা যারা জামাআতে ছালাত আদায় করতে আসে না, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪)। তবে যদি ওযরের কারণে জামাআতে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী জামাআত করে ছালাত আদায় করতে পারবে। তবে স্বামী-স্ত্রী এক কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামাআতে ছালাত আদায় করতে পারবে না। বরং নারীকে পিছনেই দাঁড়াতে হবে। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু

হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ইয়াতীম রাসূল ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলাম। আর আমার মা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৭; মিশকাত, হা/১১০৮)।

প্রশ্ন (১৪) : কোনো ব্যক্তি যদি চার ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে কিন্তু এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না তাহলে কি সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে?

-ছিয়াম
টাঙ্গাইল।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি চার ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে কিন্তু এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করে তাহলে সে দুটি বিধানের যেকোনো একটার আওতাধীনে পড়বে। এক. ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিলে বা অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের। বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমাদের এবং তাদের (অমুসলিমদের মাঝে) অঙ্গীকার হলো ছালাত। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৯৮৭; তিরমিযী, হা/২৬২১; নাসাঈ, হা/৪৬৩)। আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোনো ছাহাবী ছালাত ছাড়া অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেয়াকে কুফরী কাজ বলে মনে করতেন না (তিরমিযী, হা/২৬২২)। দুই. কিন্তু অলসতার কারণে পড়ে না তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে। সে কাবীরা গুনাহ করছে যার শাস্তি দুনিয়াতে হত্যা এবং পরকালে জাহান্নাম। আর ছালাত ছেড়ে দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে সে কাফেরও হয়ে যেতে পারে। তবে পরকালে তার বিষয়টি মহান আল্লাহর দয়ার উপর ন্যাস্ত থাকবে। যদি তিনি কালেমার বরকতে মুসলিম হিসেবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি দেওয়ার পর ক্ষমা করে দিতে চান তাহলে সে জান্নাতে আসতে পারবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিছ-ছাওয়াব।

প্রশ্ন (১৫) : সমাজে প্রচলিত আছে যে, যদি দুই রাকআত ছালাত আদায় করে সহবাস করা হয় এবং তাতে যদি সন্তান হয়, তাহলে সেই সন্তান সৎ হয়। এটি কথা কি সঠিক?

-আতাউর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : সহবাসের আগে দুই রাকআত ছালাতের বিষয়ে কিছু আছার বর্ণিত হলেও কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং নিয়মিত এমনটি করা যাবে না। বরং সহবাসের দু'আ পড়ে সহবাস করলেই সন্তান সৎ হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো। অতঃপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের ভাগ্যে কোনো সন্তান থাকলে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪১)।

প্রশ্ন (১৬) : রাসূল ﷺ সফরে এবং বাড়িতে সর্বদাই ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ও বিতরের ছালাত আদায় করতেন। এখন প্রশ্ন হলো, কেউ যদি সেই ছালাত ছেড়ে দেয় তাহলে কি তার গুনাহ হবে?

-পারভেজ ইসলাম
ফেনী।

উত্তর : সুন্নাত ছালাত আদায়ের ফযীলত অনেক। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সুন্নাত ও নফল ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়া। উম্মু হাবীবাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট বারো রাকআত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করে তার বিনিময়ে জান্নাতে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। এ সুন্নাতগুলো হলো, যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরযের) পর দুই রাকআত, ইশার (ফরযের) পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত' (ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৮; তিরমিযী, হা/৪১৪)। আবার ক্বিয়ামতের দিন ফরয ইবাদতের ঘাটতি হলে আল্লাহর হুকুমে নফল ইবাদতের নেকী দ্বারা তা পূর্ণ করা হবে (আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪; তিরমিযী, হা/৪১৩)। তবে অবজ্ঞা না করে অলসতা বা কোনো কারণ বশত সুন্নাত ছেড়ে দিলে সমস্যা নেই। আর কোনো ব্যক্তি নফল ছালাত ছাড়ার কারণে গুনাহগার হয় না। তবে অবশ্যই তিনি বড় ধরনের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রশ্ন (১৭) : প্রাণির ছবিযুক্ত পোশাক পরে ছালাত আদায় করলে কি সেই ছালাত ছহীহ হবে?

-আশিকুর রহমান
পাবনা।

উত্তর : প্রথমত মানুষ বা যেকোনো প্রাণির ছবিযুক্ত কোনো পোশাক পরিধান করা জায়েয নেই। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না যেখানে ছবি বা কুকুর রয়েছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৬)। ছোট বড় সকল মুসলিমের জন্য এ ধরনের পোশাক পরিধান করা অবৈধ। আর প্রাণির ছবিযুক্ত পোশাক পরে ছালাত আদায় করাও জায়েয নয় (আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ৬১৮১)।

প্রশ্ন (১৮) : জনৈক ব্যক্তি তিন ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। তার যুক্তি হলো, কুরআনে তিন ওয়াক্ত ছালাতের কথা আছে। সুতরাং তিন ওয়াক্ত ছালাতই আদায় করতে হবে। এখন এই ব্যক্তি মুসলিম নাকি কাফের?

-জাহিদুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর : ইসলামের স্তম্ভগুলোর অন্যতম একটি হলো ছালাত যা রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত পাওয়ার পরেই ফরয করা হয়েছিল। আর মেরাজের রাতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৭)। উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হলো- ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা (আবূ দাঊদ, হা/৩৯৩)। এছাড়াও একাধিক ছহীহ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। এক্ষণে কেউ যদি কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত ফরয বিধান অস্বীকার করে তিন ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে এবং দুই ওয়াক্ত ছেড়ে দেয় তাহলে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে (তিরমিযী, হা/২৬২২)।

প্রশ্ন (১৯) : দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি যদি নফল ছালাত বসে আদায় করে, তাহলে তার ছালাত কি কবুল হবে?

-রবিউল আলম
কুড়িগ্রাম।

উত্তর : দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য নফল ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করাই উত্তম। তবে কেউ বসে আদায় করলেও তার ছালাত ছহীহ হবে। সেক্ষেত্রে সে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৫)। পক্ষান্তরে ফরয ছালাতে দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তিকে দাঁড়িয়েই আদায় করতে হবে। কেননা ফরয ছালাতে দাঁড়ানো ছালাতের অন্যতম রুকন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো' (আল-বাক্বারা, ২/২৩৮)। সুতরাং দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি কোনো ওযর ছাড়াই বসে ফরয ছালাত আদায় করলে তার সেই ছালাত বাতিল হবে।

প্রশ্ন (২০) : একই মসজিদে একাধিকবার জুমআর জামাআত করা যাবে কি?

-আহসান হাবীব
যশোর।

উত্তর : একই মসজিদে একাধিকবার জুমআর জামাআত করা জায়েয নয়। আর রাসূল ﷺ ও ছাহাবীগণের থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই। বরং মসজিদ সম্প্রসারণ করবে এবং একটি বড় জামাআতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। জুমআর জামাআত না পেলে পরে যোহরের ছালাত জামাআতে বা একাকী আদায় করবে। অতএব একই মসজিদে একাধিকবার জুমআ আদায় করা জায়েয নয় (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ৮/২৬২)।

প্রশ্ন (২১) : ছালাতের সময় সামনে কোন স্বচ্ছ কাঁচ থাকলে তাতে যদি ছায়া দেখা যায়, তাহলে সেই কাঁচের সামনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শহীদুল্লাহ
রংপুর।

উত্তর: সাধারণভাবে কোনো স্থানে ছবি-মূর্তি থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা যে ঘরে ছবি-মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯; মিশকাত, হা/৪৪৮৯)। আর সামনে রক্ষিত কাঁচে ছায়া দেখা গেলে তার সামনে ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা তাতে মনোযোগ নষ্ট হবে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ বললেন, 'আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাত আদায়ের সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৪)।

প্রশ্ন (২২) : জনৈক আলেম বলেন, মসজিদে প্রবেশ করে ইচ্ছা করে দুই রাকআত ছালাত আদায় না করে বসে পড়লে কোনো গুনাহ হবে না, কারণ এটা নফল ছালাত। তার এ বক্তব্য সঠিক কি-না?

-নাঈম
বগুড়া।

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় না করে বসে পড়লে রাসূল ﷺ-এর আদেশকে অমান্য করা হবে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, সে যেন দুই রাকআত ছালাত আদায় করার আগে না বসে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৩)। একদা রাসূল ﷺ জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে বসে পড়ল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি কি ছালাত আদায় করেছো? সে বলল, না, তিনি বললেন, 'দাড়াও, দুই রাকআত ছালাত আদায় করো' (ছহীহ বুখারী, হা/৯৩০)। সুতরাং মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকআত ছালাত আদায় করেই বসতে হবে।

প্রশ্ন (২৩) : শিক্ষার্থীদের যদি ছালাতের জন্য পরীক্ষার হল থেকে বের হতে না দেওয়া হয় আর পরীক্ষা শেষ করার

আগেই ছালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করে এমন অবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর করণীয় কী?

- সিয়াম

আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : এমন অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী যোহরের ছালাত আছরের সাথে মিলিয়ে পড়ে নিবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ধরনের ভয়-ভীতি ও বৃষ্টি-বাদল ছাড়া যোহর ও আছর ছালাত, মাগরিব ও এশার ছালাত মদীনায় জমা করে পড়েছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৭০৫)।

প্রশ্ন (২৪) : আমি ঢাকায় থাকি, বছরে ৩ থেকে ৪ বার গ্রামের বাড়িতে আসি। আমার প্রশ্ন হলো গ্রামে থাকা অবস্থায় আমি কি কছর ছালাত আদায় করব?

-মাহমুদুল হাসান মামুন

আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : কছর ছালাতের জন্য শর্ত হলো মুসাফির অবস্থায় থাকা। তাই কেউ যদি প্রবাস বা বাহির হতে নিজ বাড়িতে আসে তাহলে সে ছালাত কছর করতে পারবে না। তবে যদি তার অন্য জায়গায় নিজস্ব বাড়ি থাকে এরপর তার পিতা-মাতার বাড়িতে কিংবা নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসে। এ ক্ষেত্রে সফরের দূরত্ব পরিমাণ হয়ে গেলে কছর করতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমরা তো খুরাসানের যুদ্ধে দীর্ঘদিন অবস্থান করি এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তুমি দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে যদিও সেখানে দশ বছর অবস্থান করো' (মাজমূউ ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা, ১৫/৩২৬)

প্রশ্ন (২৫) : জামাআতে ছালাত আদায় করার সময় ইমাম দুইদিকে সালাম ফিরানোর পর মুছল্লী সালাম ফিরাবে নাকি ইমাম একদিকে সালাম ফিরানোর পর মুছল্লীও একদিকে সালাম ফিরাবে?

- পারভেজ

লক্ষীপুর।

উত্তর : জামাআতে ছালাত আদায় করার সময় ঈমামের সালামের পিছে পিছে ডানে ও বামে মুক্তাদী সালাম ফিরাবে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ইমাম এজন্য নির্ধারিত হয়েছেন যেন তার অনুসরণ করা হয়' (আবূ দাঊদ, হা/৯৭৩, ৫১১; নাসাঈ, হা/৯২১; ইবনু মাজাহ, হা/৮৪৬; মিশকাত, হা/৮৫৭)। অর্থাৎ ইমামের আগে বা সাথে সাথে বলা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ইমামের সাথে মুক্তাদীর চার অবস্থা রয়েছে। সেগুলো হলো- ১. ইমামের আগে বেড়ে কিছু করা, এটা হারাম। ২. ইমামের সাথে সাথে রুকূ-সিজদা ইত্যাদি করা, এটি করাও হারাম। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এটা হারাম নয় বরং এটা মাকরূহ। তবে এটা যদি তাকবীরে তাহরীমার সময়ে হয়, তবে তার ছালাত হবে না। পুনরায় ছালাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। ৩. ইমামের অনুসরণ করা অর্থৎ ইমামের পরপর দেরী না করে তার অনুসরণ করা। এটা হচ্ছে সুন্নাত পদ্ধতি। ৪. ইমামের পিছনে অতিরিক্ত দেরী করে ইমামের অনুসরণ করা। এটা সুন্নাত বহির্ভূত কাজ।

জানাযা

প্রশ্ন (২৬) : শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?

-নিযামুল হাসান

শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : কোনো সন্তান মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করলে তার জানাযা দিতে হবে না। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'শিশু সন্তানের জানাযা দিতে হবে না, সে উত্তরাধিকারী হবে না, তাকে উত্তরাধিকারী বানানো হবে না যতক্ষণ না সে চিৎকার করে' (তিরমিযী, হা/১০৩২, মিশকাত, হা/১৬৯১)।

যাকাত

প্রশ্ন (২৭) : যাকাতের টাকা দিয়ে ইসলামী বইপত্র কিনে মসজিদে দান করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ সামিন

ঢাকা।

উত্তর : যাকাতের সম্পদ মসজিদের কোনো কাজে ব্যয় করা যাবে না। কেননা যাকাতের যেই আটটি খাতের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে মসজিদ সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যাকাত শুধু উক্ত খাতগুলোতেই প্রদান করতে হবে (আত-তওবা, ৯/৬০)। সুতরাং মসজিদ বা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ ও লাইব্রেরী ইত্যাদি খাতে যাকাত প্রদান করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৮) : আমি অল্প কিছু ধান করেছি লিজ হিসাবে, আমার প্রশ্ন হলো, কতটুকু পরিমাণ ধান হলে আমাকে উশর দিতে হবে, আর আমি কি লিজের ধান বাদ দিয়ে উশর বের করব নাকি পুরো ধান মেপে উশর বের করব?

-নাজমুল ইসলাম

শার্শা, যশোর।

উত্তর : শস্যের যাকাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পাঁচ ওসাকের কম উৎপন্ন ফসলে যাকাত নাই' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৪)। উল্লেখ্য যে, পাঁচ ওসাক

সমান ১৮ মন ৩০ কেজি। সুতরাং এই পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হলে যাকাত আদায় করতে হবে। যদি আসমানের পানি, ঝর্ণার পানি, নালার পানি দ্বারা জমিন সিঞ্চিত হয়, তাহলে দশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। আর সেচ দিয়ে আবাদ করলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'আসমানের পানি, ঝর্ণার পানি ও নালার পানি দ্বারা সিঞ্চিত জমির ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং সেচ দ্বারা সিঞ্চিত জমির ফসলে বিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩; তিরমিযী, হা/৬৪০)।

প্রশ্ন (২৯) : উশরের ধান গরীব হিন্দুদেরকে দেওয়া যাবে কি?

-মো. জিল্লুর রহমান
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : যাকাতের সম্পদ আট শ্রেণির মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া যায়। তার এক শ্রেণির মানুষ হলো বিধর্মী। তাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের মাল দেওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যাকাত পাবে ফকীর-মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, ইসলামের প্রতি যাদের হৃদয় আকৃষ্ট হবে তারা, গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, আল্লাহর পথে, মুসাফির। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত বিধান' (আত-তওবা, ৯/৬০)।

প্রশ্ন (৩০) : সেচ্ছায় যদি কোনো হিন্দু মসজিদে দান করে তাহলে কি তা গ্রহণ করা যাবে ?

- মোঃ রবিউল ইসলাম
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : সেচ্ছায় যদি কোনো হিন্দু মসজিদে দান করে তাহলে তার দান গ্রহণ করা যাবে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, পবিত্র বস্তু ব্যতীত তিনি কোনো কিছু কবুল করেন না' (মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবৈধ সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ মসজিদ আল্লাহর জন্য (আল-জিন, ৭২/১৮)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ নাকি অবৈধ? একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ। যেমন আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে জনৈক মুশরিক একটি রেশমী জুব্বা উপহার দিয়েছিলেন (বুখারী, ১/৩৫৬, মুশরিকদের উপঢৌকন অধ্যায়)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহূদীদের বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৬১৭)। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল নওমুসলিম খ্রিষ্টানকে তাদের পূর্বের গীর্জার স্থানকে মসজিদে পরিণত করার নির্দেশ দেন এবং সেখানে ছালাত আদায় করতে বলেন (নাসাঈ, হা/৭০১; মিশকাত, হা/৭১৬)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মূর্তিমুক্ত গীর্জায় ছালাত আদায় করতেন (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)। সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনাগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুর সম্পদ মসজিদে লাগানো যায়।

বিবাহ ও তালাক

প্রশ্ন (৩১) : তালাক দেয়ার জন্য মানুষকে সাক্ষী রেখে তাদের সামনে তালাক দিতে হবে নাকি মনে মনে তালাক দিলে তালাক হবে, কোনটি সটিক?

-হাম্মাদ রেজা
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : মুখে উচ্চারণ না করে যদি মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ত করে, তাহলে সেটি তালাক হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের জন্য তাদের মনের কল্পনাগুলোকে মাফ করে দিয়েছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৭)। আর যদি মুখে উচ্চারণ করে, তাহলে স্ত্রী না জানলেও সেটি তালাক হিসেবে গণ্য হবে (ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ২০/২১১)।

প্রশ্ন (৩২) : আমি একজন মুসলিম ঘরের সন্তান। আমি এক হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করে ইসলামের পথে আনতে চাই। সেক্ষেত্র আমি কি হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করতে পারব?

- রুবায়েত হাসান
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : একজন মুসলিম পুরুষ একজন অমুসলিম মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। মূলত, মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম। ওদেরকে তোমাদের যতই ভালো লাগুক না কেন (আল-বাক্বারা, ২/২২১)। তবে যদি অমুসলিম মেয়ে মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে তাকে বিবাহ করতে পারবে।

প্রশ্ন (৩৩) : এক বিবাহিতা মহিলা এক পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তাকেই বিবাহ করে। কিন্তু তার আগের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। এখন তার পরের স্বামীর ঘরে দুইটি সন্তানও হয়েছে। এমতাবস্থায় কী করণীয়?

- আলমগীর হোসেন
বগুড়া।

উত্তর : যেহেতু আগের স্বামী থেকে তালাক হয়নি, তাই সেই মহিলা আগের স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই আছে। আর কারো স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাকে বিবাহ করলে সেটি বিবাহ হিসাবে গণ্য

হবে না। বরং সহবাস করলে তা ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, '...সকল বিবাহিতা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ' (আন-নিসা, ৪/২৪)। আর ব্যভিচার করা কাবীরা গুনাহ (আল-ইসরা, ১৭/৩২)। সুতরাং এমতাবস্থায় সেই মহিলার সাথে সংসার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আর এই পাপের কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

হাদীছের তাহকীক

প্রশ্ন (৩৪) : সালাবা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর সম্পর্কে একটা কাহিনি শুনি যে, এক বেগানা নারীর দিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার চোখ পড়ে যায়। এর ফলে তিনি নিজের পাপের কথা ভেবে কাঁদতে কাঁদতে পাহাড়ে চলে যান। অনেক দিন পরে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে খুজতে যান। পরে তাকে খুজে পান এবং সে রাসূলের কোলে মাথা রেখে মারা যান। এই ঘটনা কি সত্য?

-হাসিবুল হাসান ইমন
খিলগাঁও, ঢাকা ১২১৯।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি সত্য নয় (তানযীহুশ শারীআহ, ২/২৮৩; আল-মাওযূআত লি ইবনিল যাওযী, ৩/৩৪৭)।

প্রশ্ন (৩৫) : শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তামামুল মিন্নাহ' কিতাবে নাকি ৩টি শর্তে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা বৈধ বলেছেন, কথাটি কতটুকু সত্য? এবং ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ মানা প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ -এর মতামত জানতে চাই।

-আবু হুরায়রা সিফাত
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তিনটি শর্তে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা বৈধ বলেছেন (তামামুল মিন্নাহ, ৩৬ পৃ.)। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ মানার বিষয়ে চারটি শর্ত আরোপ করেছেন- (১) হাদীছটি ফাযায়েলে আমল সম্পর্কিত হতে হবে (২) হাদীছটি মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল হওয়া যাবে না (৩) আমলটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে (৪) আমলের সময় দৃঢ় বিশ্বাস না রেখে সতর্কতা স্বরূপ করা হবে।

প্রশ্ন (৩৬) : কোনো মুসলিম ভাইকে সাহায্য করার জন্য কোথাও যাওয়া আমার কাছে মসজিদে নববীতে দশ বছর ইতিকাফ করার চেয়ে প্রিয়। এই হাদীছের রেফারেন্স ও তাহকীক জানতে চাই?

-রাজিব রেজা
নেত্রকোনা।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি যঈফ (শুআবুল ঈমান, ৩/৪২৪; তারীখে বাগদাদ, ৪/৩৪৭)।

হালাল হারাম

প্রশ্ন (৩৭) : আমার জন্মগতভাবে ডান হাতে সমস্যা থাকায় আমি সকল কাজে বাম হাত ব্যবহার করি যেমন খাওয়া, পানি পান করা, লেখা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বাম হাতে খাদ্যগ্রহণ ও পানি পান করলে আমার গুনাহ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল গালিব
মেহেরপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে খাবার খাওয়া, পানাহার ইত্যাদি কাজে ডান হাত ব্যবহার করতে হবে। উমার ইবনে আবী সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। একদা খাবার পাত্রে আমার হাত ছুটাছুটি করছিল। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'ওহে বালক! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে এক তরফ থেকে খাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৭৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২০২২)। সালামা ইবনে আকওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে একটি লোক তার বাম হাত দ্বারা আহার করল। (এ দেখে) তিনি বললেন, 'তুমি ডান হাত দ্বারা খাও'। সে বলল, আমি পারব না! তিনি বদ-দু'আ দিয়ে বললেন, 'তুমি যেন না পারো'। ওর অহংকারই ওকে (কথা মানতে) বাধা দিয়েছিল। তারপর থেকে সে আর তার হাত মুখে তুলতে পারেনি (ছহীহ মুসলিম, হা/২০২১)। তবে জন্মগতভাবে ডান হাতের সমস্যা থাকার কারণে বাম হাত দিয়ে খাওয়া, পানি পান করা, লিখা ইত্যাদি করলে কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না। সে ভালো যা করেছে সে তার ছওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের প্রতিদান তার ওপরই বর্তাবে' (আল বাকারা, ২/২৮৬)।

প্রশ্ন (৩৮) : টেলিভিশন ঠিক করে যে টাকা নেয় সেটা কি হালাল নাকি হারাম। কারণ সেই টেলিভিশন দিয়ে হয়তো অনেকে খারাপ ভিডিও দেখে।

- মো. সাদ্দাম হোসেন
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : টেলিভিশন ঠিক করে উপার্জন করা জায়েয হওয়াতে সন্দেহ রয়েছে। কেননা সাধারণত তার ব্যবহার মাধ্যম অবৈধ লক্ষ করা যায়। কেননা তাতে অশ্লীল কর্মকাণ্ড, গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে যা সম্পূর্ণভাবে হারাম। তবে টেলিভিশন এমন একটি যন্ত্র যা কল্যাণকর কাজেও ব্যবহার করা যায়। দ্বীন সম্পর্কে জানা, বক্তব্য শোনা ইত্যাদি। কাজেই তাকে ভালো কাজের মাধ্যমও বলা যায়।

সুতরাং এটি যদি কল্যাণের উদ্দেশ্যে মেরামত করে থাকে তাহলে তাতে নেকী পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নেক কাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে। এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৯) : জাত উন্নয়নের জন্য গরু, ছাগল এর কৃত্রিম প্রজনন কি জায়েজ ?

-জয়নুল আবেদীন
গাইবান্ধা।

উত্তর : জাত উন্নয়নের জন্য গরু, ছাগল এর কৃত্রিম প্রজনন করা জায়েয। পুরুষ ছাগলের বীর্য মাদি ছাগলের যৌনাঙ্গে প্রবেশ করাকে কৃত্তিম প্রজনন বলে। এটা করা হয় মাল বা গরু, ছাগল বেশী করা এবং জাত উন্নয়নের জন্য। আর এতে ইসলামে কোনো বাধা নাই। ইসলামী বিধানগুলো মানুষ ও জিনের জন্য, সেখানে পশু-প্রাণি আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, এভাবে আল্লাহ তার আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর’ (আল-বাকারা, ২/২১৯)। সুতরাং তাদের জাত উন্নয়নে যেকোনো পন্থা অবলম্বন করা যায়।

প্রশ্ন (৪০) : আল-মুক্বীত নাম রাখে যাবে কি? যদি না রাখা যায় তাহলে এমতাবস্থায় কী করণীয়? কারণ আমার সার্টিফিকেটে আল-মুক্বীত নাম লেখা আছে।

- রফিকুল ইসলাম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : আল-মুক্বীত নাম রাখা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামগুলোর একটি নাম হলো আল-মুক্বীত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে ভাল সুপারিশ করবে, তা থেকে তার জন্য একটি অংশ থাকবে এবং যে মন্দ সুপারিশ করবে তার জন্যও তা থেকে একটি অংশ থাকবে। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের হেফাযতকারী’ (আন-নিসা, ৪/৮৫)। আল-মুক্বীতের অর্থ হলো হেফাযতকারী, হিসাবগ্রহণকারী এবং পর্যবেক্ষণকারী। যদি কেউ এই নাম রাখতে চায়, তাহলে আব্দুল মুক্বীত রাখতে হবে। এখন আপনার করণীয় হলো, এই নাম পরিবর্তন করে আব্দুল মুক্বীত নাম রাখা।

প্রশ্ন (৪১) : ইসলামী শরীআতে সাবান, শ্যাম্পু ব্যবহারের বিধান কী? বিশেষ করে অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ব্যাপারে।

-রুনা খাতুন
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ সাবান বা শ্যাম্পু শুকরের চর্বি দ্বারা তৈরী নয়, তাহলে ব্যবহার করা যাবে। এতে কোনো সমস্যা নাই। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘হালালও স্পষ্ট আর হারামও স্পষ্ট’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫২)। আর শুকর খাওয়া হারাম এবং তার হাড়-হাড্ডি, রক্ত, মাংস ও চর্বি সবই নাপাক। আর নাপাক জিনিস দ্বারা কাপড়-চোপড়, শরীর ইত্যাদি পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু পাক হতে পারে না। তাই এসব জিনিস ব্যবহারের পূর্বে পাকের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। বিশেষ করে অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আপনি আপনার কাপড় পাক-পরিষ্কার করুন’ (আল-মুদ্দাছ্ছির, ৭৪/৪)। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন সাক্ষাৎ করার জন্য। অতঃপর তিনি এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট একজন লোককে দেখে বললেন, এ লোক কি এমন কিছু পায় না যার দ্বারা সে তার মাথা পরিপাটি করে রাখবে? আর ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত একজনকে দেখতে পেয়ে বললেন, এ লোক কি এমন কিছু পায় না যার দ্বারা সে তার কাপড় ধৌত করবে? (আবূ দাঊদ, হা/৪০৬২; মিশকাত, হা/৪৩৫১)। এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিজেকে সর্বদায় ছিমছাম ও পরিপাটি রাখতে হবে। শরীর ও কাপড় পরিষ্কার রাখতে হবে। তা পবিত্র ও পরিষ্কারক যে কোনো জিনিস দ্বারা হোক না কেন, সাবান হোক, শ্যাম্পু হোক ইত্যাদি পাক হলেই হবে।

প্রশ্ন (৪২) : আমার বন্ধু একটা সূদী ব্যাংক থেকে শিক্ষাবৃত্তি পায়। বৃত্তির টাকাটা হালাল হবে কিনা?

-নিশাত মাহমুদ
দিনাজপুর।

উত্তর : হালাল হবে না। কেননা সূদের টাকা হারাম। আর মহান আল্লাহ হালাল ভক্ষণ করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘হে রাসূলগণ! আপনারা হালাল ভক্ষণ করুন...’ (মুমিনূন, ২৩/৫১)। সূদী প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রচারণা জোরদার করে। আর তাদের এ বৃত্তি গ্রহণ তাদের প্রচারনায় সহযোগিতা করার নামান্তর। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা পাপের কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। তিনি আরো বলেন, ‘আল্লাহ সূদ নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান বর্ধিত করেন’ (আল-বাক্বারা, ২/২৭৬)। সুতরাং কোনো ছাত্র অভাবী হলে তার জন্য ছাদাক্বা ও যাকাতের টাকা গ্রহণ করাই বেশি উত্তম। যাকাত ও

ছাদাক্বার টাকা খাওয়া হারাম নয়। এ ধরনের শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

প্রশ্ন (৪৩) : মোবাইলে টাকা রিচার্জ করলে ক্যাশব্যাক পাওয়া যায় তা কি জায়েজ না হারাম?

-মো. জিল্লুর রহমান
মিরপুর-১২, ঢাকা।

উত্তর : যদি কোনো সূদী প্রতিষ্ঠান ক্যাশব্যাক দেয়, তাহলে তা নেওয়া জায়েয হবে না। যেমন ধরুন, বিকাশ থেকে রবিতে ১১৫ টাকা রিচার্জ করলে ১১ টাকা বিকাশ একাউন্টে ক্যাশব্যাক। এমনটি গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা বিষয়টি অস্পষ্ট। আর এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করো এবং স্পষ্ট বিষয় গ্রহণ করো' (নাসাঈ, হা/৫৭১১; মিশকাত, হা/২৭২৩)। তবে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তার থেকে পণ্য ক্রয় করার কারণে যদি ক্যাশব্যাক দেয়, তাহলে সেটা নেওয়া জায়েয আছে। কেননা ব্যবসার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ইচ্ছা করে পণ্যের মূল্য কমিয়ে বিক্রি করলে উদারতা হবে অথবা ক্রেতা কিছু মূল্য বেশি দিয়ে ক্রয় করলে উদারতা হয়। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়' (ছহীহ বুখারী, হা/২০৭৬)।

প্রশ্ন (৪৪) : কোনো মুসলিম যদি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করে তাহলে তার ইনকাম কি হালাল হবে?

-শাহরিয়ার আহমেদ
ময়মনসিংহ।

উত্তর : যে কোনো চাকরি করে ইনকাম করা বৈধ। তবে তা হারামের কোনো জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। তাই আল্লাহ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক অন্বেষণ করো এবং তারই ইবাদত করো' (আল-আনকাবুত, ১৭)। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যাতে তোমার উপকার হয় তাতে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর মাধ্যমে সহযোগিতা কামনা করো এবং অক্ষমতা প্রকাশ করো না (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ, হা/৪১৬৮)।

প্রশ্ন (৪৫) : ইসলামে সন্তান দত্তক নেয়ার বিধান কী?

-আলমগীর হোসেন
যশোর।

উত্তর : পালক সন্তানের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা হলো, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং তোমাদের বন্ধু' (আল-আহযাব, ৩৩/৫)। অতএব যে সন্তানকে লালনপালন করা হবে তাকে তার প্রকৃত বাবা মায়ের দিকেই সম্পৃক্ত করতে হবে, পালনকারীকে বাবা মা বানানো কোনোভাবেই শরীআতসম্মত নয়।

প্রশ্ন (৪৬) : আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, অনেকেই সার্টিফিকেটে তাদের বয়স কমিয়ে নেয় যাতে তারা সরকারি চাকরীর জন্য বেশী বয়স পায়। এখন প্রশ্ন হলো, ইচ্ছা করে এমন কাজ করলে সেটি কি বৈধ হবে?

-আনছার আলী
নীলফামারী।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে জন্মতারিখ পরিবর্তন করা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত যা ইসলামী শরীআতে জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২)। সুতরাং এধরনের কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৪৭) : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কোথায় ইদ্দত পালন করবে?

-আব্দুল্লাহ ওমর
পাবনা।

উত্তর : স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করতে হবে। যায়নাব বিনতু কাব ইবনু উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণিত, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বোন ফুরাইআহ বিনতু মালিক ইবনু সিনান তাকে জানিয়েছে যে, তিনি বনু খুদরায় তার পিতার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে অনুমতি চাইলেন। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক গোলামের সন্ধানে গিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি আল-কাদূম সীমায় পৌঁছে তাদের দেখতে পেলেন। এরপর গোলামরা তাকে হত্যা করে ফেলে। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, আমি আমার পিত্রালয়ে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমার জন্য তার মালিকানাধীন বাসস্থান অথবা খোরপোষ রেখে যাননি। মহিলা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে হুজরা অথবা মসজিদ পর্যন্ত গেলে তিনি আমাকে ডাকলেন বা কাউকে দিয়ে ডাকালেন। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি বলেছিলে? তখন আমি আমার স্বামীর ঘটনাটি পুনরাবৃত্তি করি। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি ইদ্দাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার (স্বামীর) ঘরেই অবস্থান করো'। মহিলাটি বললেন, আমি সেখানে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করলাম। উছমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার যুগে আমার নিকট লোক পাঠিয়ে আমার ঘটনাটি জানতে চাইলে আমি তাকে অবহিত করি। তিনি তা

অনুসরণ করলেন এবং সেই অনুযায়ী বিধান জারি করলেন (আবূ দাঊদ, হা/২৩০০)। তবে উক্ত বাড়ি যদি তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাজনক না হয় কিংবা তাকে দেখাশুনা করার মতো কোনো মাহরাম পুরুষ না থাকে, তাহলে বাবার বাড়িতে বা যেখানে তার জন্য নিরাপদ সেখানে গিয়ে ইদ্দত পালন করতে পারে (ইবনু মাজাহ, হা/২০৩২-৩৪)।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪৮) : আমার বড় বোন দুইটি মেয়ে রেখে অনেক বছর আগে মারা গেছে। বোনের মেয়ে এখন সাবালিকা এবং দুই জনই বিবাহিতা। ওদের বাবা আবার বিবাহ করেছে। এখন ওই বোনের মেয়েরা কি ওদের নানা বাড়ির সম্পত্তি পাবে?

-মো. মুখতার হোসেন।
মৌলভীবাজার।

উত্তর : তারা তাদের নানার বাড়ির সম্পদ ওয়ারিশ সূত্রে পাবে না। কারণ তারা আসহাবুল ফুরূযদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তাদের নানা তাদের জন্য অছিয়ত করলে তারা তাদের নানার বাড়ি হতে সম্পদ পাবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘উত্তরাধিকারের জন্য কোনো অছিয়ত নেই’ (আবূ দাঊদ, হা/২৮৭০; নাসাঈ, হা/৩৬৪১)। এই হাদীছে বুঝা যায় যে, নাতি-নাতনিদের জন্য অছিয়ত করা যাবে। কারণ তারা উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর অছিয়তের সর্বোচ্চ সীমা হলো এক-তৃতীয়াংশ। সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছের অসুস্থতার সময় নবী ﷺ তার কাছে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পুরো সম্পদের ব্যাপারে অছিয়ত করতে পারি কি? তিনি বললেন, ‘না’। তিনি আবার বললেন, অর্ধেক। তিনি বললেন, ‘না’। আবার বললেন, এক-তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, ‘এক-তৃতীয়াংশ’। ‘আর এক-তৃতীয়াংশই তো অনেক’ (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৮)।

অন্যান্য

প্রশ্ন (৪৯) : কী কারণে আশূরায়ে মুহাররম এত গুরুত্বপূর্ণ? বিস্তারিত জানতে চাই?

-ওমর ফারুক
রাজশাহী।

উত্তর : আশূরায়ে মুহাররমের গুরুত্বের মৌলিক কারণ হলো, এদিনে মহান আল্লাহ মূসা ﷺ ও তাঁর ক্বওমকে অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তাকে ও তার লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বর্ণনা করেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন দেখতে পেলেন ইয়াহূদীগণ ‘আশূরা’ দিবসে ছওম পালন করে। তাদেরকে ছিয়াম পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ ও বনী ইসরাঈলকে ফেরাঊনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানার্থে ছওম পালন করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমাদের চাইতে আমরা মূসা ﷺ-এর অধিক নিকটবর্তী’। এরপর তিনি ছিয়াম পালনের আদেশ দেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩০)। দ্বিতীয়ত, নাজাতে মূসার শুকরিয়া স্বরূপ এদিন ও তার পূর্বে একদিন ছিয়াম পালন করলে তা আল্লাহর নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছাগীরা) গুনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হয়। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘আর আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাব ‘ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪)।

উল্লেখ্য যে, হুসাইনের শাহাদাত বরণের সাথে আশুরায়ে মুহাররমের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই (ইবনু হাজার আসক্বালানী, দারুল ইছাবা, ১/৩৩১ পৃ.)।

প্রশ্ন (৫০) : মুহাররমের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম পালন করলে ৫০ বছরের নফল ছিয়ামের নেকী লেখা হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
পাবনা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে শুধু ৯ ও ১০ তারিখে ছিয়াম পালন করার ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» " ‘আর আশূরার দিনের ছিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমার প্রত্যাশা, আল্লাহ এর দ্বারা আগের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০৩; মিশকাত, হা/২০৪৪)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘রামাযান মাসের ছিয়ামের পরে উত্তম ছিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররম মাসের আশূরার ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হলো রাতের ছালাত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩; মিশকাত, হা/২০৩৯)। উল্লেখ্য যে, মুহাররম মাসের ফযীলত সম্পর্কে অসংখ্য জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে। এগুলো থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ
জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :

Ac/Name : Al Jamiah As Salafiya General Fund
Ac/No : 20501130204367701
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

Ac/Name : Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Ac/No : 20501130204367417
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ

Ac/Name : Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Ac/No : 20501130204367316
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য :

Ac/Name : Nibras Yatim Kollan Fund
Ac/No : 20501130204367600
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :

Ac/Name : Al-Itisam Dawah Fund
Ac/No : 20501130204367802
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

মানব সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
ত্রাণ সহায়তা, অক্সিজেন বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ :

Ac/Name : Nibras Tran Tahbil Fund
Ac/No : 20501130204367903
Islami Bank Bangladesh Ltd. Rajshahi Branch

Swift Code : IBBLBDDH113
Routing No: 125811932

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

bKash	ROCKET রকেট পারসোনাল	bKash এজেন্ট	নগদ
01717-088967	01835-984648-7	01793-638180	01717-088967
01835-984648	01784-213178-5	01904-122546	01835-984648
01773-925235			01407-021800

bKash মার্চেন্ট : 01974-088967 (বিকাশের ৪ নং অপশান থেকে পেমেন্ট করতে হবে)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

Monthly Al-Itisam الاعتصام 6th Year, 10th Part, August 2022, Price : 25.00

BONOJO

Organic BONOJO ™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা
অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

পোশাক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১২৮ মূল্য : ৯০টাকা

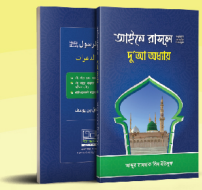

হজ্জ ও উমরা
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১২৮ মূল্য : ৯০টাকা

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮০ মূল্য : ১৫০টাকা

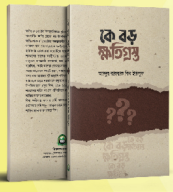

আইনে রাসুল (ছা:) দু'আ অধ্যায়
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২০৮ মূল্য : ১০০টাকা

মরণ একদিন আসবেই
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮৮ মূল্য : ১৫০টাকা

তুবা পাবলিকেশন
TUBA PUBLICATION

সার্বিক যোগাযোগ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
০১৩০১-৩৯৬৮৩৬, ০১৪০৭-০২১৮৪৯

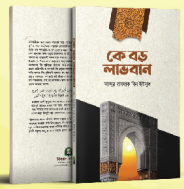

রিযিক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
পৃষ্ঠা : ৯৬ মূল্য : ৭০টাকা

কে বড় লাভবান
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮০ মূল্য : ১৫০টাকা

তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১৯৬ মূল্য : ১০০টাকা